# আস্থারধ্বনি

কিঙ্কর আহ্সান

১.

গতকাল সন্ধের দিকে মারা গেছে পুতুল ।
অল্প বিষের সাপগুলোর ভিড়ে কোনো এক বিষধর সাপ দংশন করেছে তাকে ।
বিষের যন্ত্রণা নিয়ে কতক্ষণ টিকতে পেরেছিল মেয়েটা জানা নেই ।
পুতুলের লাশ প্রথম দেখতে পায় বাড়ির রাজহাঁসগুলো ।
সন্ধে হলেই ঠিক ঠিক বাড়ি ফিরে আসে তারা । ঢুকে যায় যার যার খোপে (গৃহস্থের হাঁস, মুরগি রাখার ছোট্ট কাঠের ঘর) ।
সেদিন বড্ড দেরি হচ্ছিল । চৌপর দিন পুকুরে সাঁতার কেটে, শামুক খেয়েও রাজহাঁসগুলোর এমন দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন মা ।
পুতুলকে নিয়ে আমরা ভাবিনি । সন্ধেবেলায় বাড়ি না ফিরলেও এমন বেয়ারা মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করতে হয় না ।
আমি আর মা বরং দুই ব্যাটারির টর্চ নিয়ে কবরস্থানে হাঁস খুঁজতে যাই ।
খুঁজতে গিয়ে শুনি রাজহাঁসগুলোর ডাকাডাকি । একসাথে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে সব মিলে ।
কাছে গিয়ে দেখা যায় পুতুলের নিথর শরীরটা ঘিরে ধরে আছে হাঁসগুলো । কেউ আবার ছোট ছোট কাদামাখা ভেজা পা নিয়ে উঠে পড়েছে শরীরের ওপর ।
কেন জানি মনে হয়, পুতুল সাপে কাটার সময় হেসেছিল । মৃত পুতুলের মুখের এক কোনায় ফুটে থাকা বড় সজীব আর প্রাণবন্ত হাসি হাসি মুখ দেখে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক ।
বিষের প্রচণ্ড যন্ত্রণায়ও সে চোখ বন্ধ করেনি । অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি অসীম আকাশের দিকে তাক করা তার অদ্ভুত সুন্দর, নিষ্পলক চাহনিটা !
আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরটার একপাশের জলের রং কালো । গভীর কালো ।
দেখলে মনে হয় একতাল নিকষ, অসহ্য কালো আঁধারকে টুপ করে গিলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পুকুরটা ।

কালো হওয়ার পেছনের কারণ হলো, পাড় ধরে দাঁড়ানো দৈত্যাকার সব নারিকেল আর সুপুরি গাছ। তাদের পাতার ভিড় ঠেলে সূর্য এসে ঠাঁই নেবে এমনটি হবার জো নেই।

আলো না আসায় জল খুব শীতল। গরমকালেও হাত ভেজানো মুশকিল হয়ে পড়ে।

পুকুরটার এ পাশে কেউই আসে না তেমন একটা।

পাড় ঘেঁষেই আমাদের পারিবারিক কবরস্থান। কোন আক্কেলে আমার দাদাজান কবরস্থানের পাশে পুকুর কাটল কে জানে!

দাদা, দাদি, চাচা, ফুপু প্রায় সবাই এসে ঠাঁই নিয়েছে কবরস্থানে। কেউই বেঁচে নেই আর।

এক সময়ের প্রাণোচ্ছল মানুষগুলোকে গ্রামের সবাই এখন ভয় পায়।

মৃত মানুষ আর কবরস্থানে নাকি বিশ্বাস করতে হয় না। কারণ রাত-বিরাতে যেকোনো অলৌলিক ঘটনাই ঘটতে পারে! হতে পারে অমঙ্গল!

এ দিকটায় সাপখোপের আড্ডাও বেশি।

কিছুদিন আগে পুকুরের সবচেয়ে কাছের কবরটা ভেঙে গিয়েছিল।

বড় চাচার কবর। কবরের ভেতরটায় কাদা আর জলে মাখামাখি হয়ে একদম যাচ্ছেতাই অবস্থা!

বাবা কবর বাঁধাই করতে গিয়ে দেখেছিলেন, একে অপরকে পেঁচিয়ে ধরে গোটা দশেক লিকলিকে সাপ ভেতরে আস্তানা গেড়েছে ।

সে এক দেখার মতো দৃশ্য!

লাঠি দিয়ে খোঁচা মারলে পিচ্ছিল দেহগুলো নিয়ে তারা আরো বেশি জড়িয়ে ধরে একজন আরেকজনকে।

সাপের মতোন পুকুরটা মাছেরও আড্ডাখানা।

কবরের পাশে বোকার মতোন দাঁড়িয়ে থাকা পুকুরটায় বাড়ির কেউ মাছ ধরতে নামে না। তাই মাছেরা বাড়ছে, বড় হচ্ছে নিজেদের ইচ্ছেমতো।

দিনভর ঘাই দেয় তারা। বয়স্ক, বেঢপ কিছু মাছ প্রায়ই চলে আসে পাড়ের কাছাকাছি। ভাঙা ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে তখন তাদের ধূসর, সাদাটে লোভনীয়

শরীর দেখা যায়। বছরের পর বছর শ্যাওলা জমে কোনো কোনো মাছের শরীর সবুজাভ হয়ে উঠেছে যেন!

পুকুরটা ভর্তি হয়ে আছে পাড় ধরে লাগানো গাছগুলোর ঝরেপড়া পাতায়। পাতাগুলো নৌকোর মতো বাতাসের টানে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায় শুধু। মাঝে মাঝে দু-একটা পাতার আড়াল হতে উঁকি দেয় জলসাপ। মুখে থাকে সদ্য শিকার করা হতভাগা কোনো ব্যাঙ। সাপের মুখে থাকা অবস্থায়ও ব্যাঙের বুক হাপরের মতো ওঠানামা করে।

এত আলো-বাতাসের ভেতরেও তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়! আকাশের দিকে পা-গুলো মেলে প্রাণীটির বেঁচে থাকার করুণ আকুতি দেখতে ভালো লাগে বেশ।

সাপ মুখ একটু দেখিয়েই ডুব দিয়ে চলে যায় আবার কই না কই!

লুকোচুরি খেলায় পাল্লা দিয়ে পারাই যায় না এদের সাথে।

এসব সাপে মানুষ মারা যায় না। তাদের বিষের জোর তেমন একটা বেশি না। আমার ছোট বোন পুতুলও তেমনটাই জানত। অল্প বিষের এ সাপগুলোকে থোড়াই কেয়ার করে প্রায়ই চলে যেত কবরস্থানে।

বেয়ারা মেয়েটার সুপুরি খাওয়ার নেশা।

লোভ সামলাতে না পেরে, ভয় ভুলে কবরস্থানের জায়গায় লাগানো সুপুরির গাছগুলো থেকে জোগাড় করত কাঁচা, পাকা সুপুরি। কখনো গাছের নিচে পড়ে থাকা সুপুরির খোল নিয়ে এসে তাতে চড়ে বসে আমাকে বলত, 'ভাইজান সামনের দিকটা ধইরা টানেন তো। এইডা আমার গাড়ি আর আপনে আমার ড্রাইভার।'

তারপর হাসত। হাসতে হাসতে চোখে জল চলে আসত তার। আমার দু-চারটে কিল তার পিঠে পড়লেও থামত না।

হাসতেও পারে মেয়েটা! জানি না মৃত্যুর আগে হেসেছিল কি না!

পুতুল মারা যাওয়ার পর ঘরের একমাত্র জোয়ান ছেলে হিসেবে আমার ওপর অনেক ধকল গিয়েছে। মা থেকে থেকে একটু পর পর জ্ঞান হারাচ্ছিল। জ্ঞান

ফিরলেই 'পুতুলরে-পাগলি মা আমার–কই গেলি... ।' বিলাপ করে সেকি কান্না তার । বাড়িজুড়ে লোকজনের কান্নায় কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়!
বাবা হুজুরকে খবর দিয়েছিলেন । সারা রাত লাশের পাশে বসে কোরআন শরিফ পড়েছেন লোকটা ।
আতর আর ধূপদানির গন্ধে ভরে গিয়েছিল পুরো বাড়ি । হাটে গিয়ে বরফ নিয়ে এসেছি আমি । পুতুলের শরীর যাতে পচে না যায় সে জন্য বরফের দরকার ছিল খুব । চা পাতাও নিয়ে আসা হয়েছে পনেরো-ষোলো কেজি । বরফের চেয়ে চা পাতাই নাকি শরীরের পচন ঠেকানোর জন্য ভালো ।
কাফনের কাপড় কিনতে হয়েছে, লাশ কারা গোসল করাবে সেসব ঠিক করতে হয়েছে, গ্রামে মাইকিং করে মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে, পারিবারিক কবরস্থানে কার পাশে পুতুলের জন্য কবর খোঁড়া হবে সে জায়গা বাছাই করতে হয়েছে–কাজের কোনো শেষ নেই ।
হাজারো ঝক্কি ঝামেলায় সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি । সকালেও বিশ্রামের ফুরসত নেই ।
যেসব আত্মীয়কে খবর দেওয়া হয়েছিল রাতে একে একে ভিড় করল সবাই বাড়িতে ।
তাদের সবাইকে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছি । পুকুরের বর্ণনা, ভাঙা ঘাটের বর্ণনা, কী সাপ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে তার বর্ণনা, মারা যাওয়ার সময় পুতুল কাত হয়ে পড়েছিল না লম্বা হয়ে আকাশের দিকে চিত হয়ে শুয়েছিল তার বর্ণনা–এমন সব হাজারো কথায় সবার মনোরঞ্জন করেছি । তাদের সাথে মা আরেক দফা কান্নাকাটি করেছেন ।
সকাল গড়িয়ে যখন দুপুর হলো তখন সবকিছু শান্ত হয়েছে একটু একটু । হুজুর কিসের জন্য লাশ দাফনে এত দেরি করছিলেন বোঝা যাচ্ছিল না । হৈ-হুল্লোড়ের ভেতরে কে যেন উঠোনে ছেড়ে দিয়েছিল রাজহাঁসগুলোকে । তারা ঘুরছিল এলোমেলোভাবে । আজ কারো সাঁতার কাটায় মন নেই ।
ভাঙ্গা ঘাটটার পাশে বসে একটু জিরিয়ে নিতে নিতে বোনকে ভুলে স্বার্থপরের মতো এলোমেলো আকাশ পাতাল ভাবনা ভাবছিলাম ।

হঠাৎ কে যেন এসে বলল, বাবা ডাকছেন আমাকে। বাবাকে পেলাম তার ঘরেই। চোখ দেখলেই বোঝা যায় সবার আড়ালে লোকটা কেঁদেছেন সারা রাত।

কান্নাকাটি অসহ্য লাগে আমার। এক জীবনে অনেক কেঁদেছি। আর না।

বাবার পাশে গিয়ে বসলাম।

ধূপ আর আতরের গন্ধটা ভালোমতোই ছড়িয়েছে বাড়িময়। কেমন যেন ঘোর লাগানো ঘ্রাণ। বাবা পুরনো ট্রাঙ্ক থেকে দাদাজানের মক্কা থেকে আনা আতরের শিশিটা বের করে আঙুলের তেলোয় মাখিয়ে একটুখানি আতর লাগিয়ে দিলেন শরীরে।

এমন পাগলামি দেখে অবাক হলাম না। পুতুলের শোকে ভালোমতোই কাবু হয়েছেন।

আতর লাগানোর পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা রে, তোর বড় ভাইরে না জানানোডা কি ঠিক হইল? ছোড বইন তার। কবর দেওনের আগে বইনের মুখডা একবার দেখ্‌বার ইচ্ছা তো তার হইবার পারে। পুতুল বড় আদরের ছিল তার। বড় আদরের বইন। একবার জানা তারে খবরডা। নাইবা আইল, তাও জানা। একবার।'

এই প্রথম আমি কাঁদলাম। বাবাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে পাগলের মতো কাঁদলাম।

বাবাকে জড়িয়ে পুত্রের এ কান্নার কতটুকু পুতুলের জন্য আর কতটুকু বড় ভাইজানের জন্য তা আমার জানা নেই।

সত্যিই জানা নেই।

## ২.

জুমার নামাজের পর মিলাদের আয়োজন করা হয়েছে মসজিদে।

পুতুলের জানাজা নামাজ শেষে আজকের দিনটিতে সবাইকে মিলাদে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

বেলকুচি গ্রামের একমাত্র মসজিদ ‘বায়তুল আমান’। অনেক দূরের গ্রাম থেকেও নামাজ পড়তে এখানে জড়ো হয় লোকজন।
তবারকের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে মসজিদে। গরম গরম আমৃত্তি আনা হয়েছে কালিশুরির বাজার থেকে। সাথে রয়েছে নিমকি আর দানাদার।
ভালো খাবারের খোঁজ লোকজন পেয়েছে আগেই। আশপাশের দশ গ্রামের মানুষ তাই এসে করেছে ভিড়।
মসজিদের ভেতর বসার জায়গা হয়নি সবার। বাইরে মাঠের ওপর হোগলা, মাদুর আর বিছানার চাদর বিছিয়ে করা হয়েছে বসার ব্যবস্থা।
মানুষ মরলে লোকগুলোর সোনায় সোহাগা ! চল্লিশা, মিলাদ সব মিলিয়ে পেটপুজোর কাজটা একদম মন্দ হয় না তাদের।
নামাজে বাবা আজ ইমামতি করছেন।
মসজিদের হুজুর অসুস্থ থাকলে প্রায়ই ইমামতি করেন। এ কাজ তার বড়ই প্রিয়। শৈশবে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন মাদ্রাসায়। কণ্ঠ ভালো। শুনেছি আজান দিয়ে নানা প্রতিযোগিতায় কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছেন।
থেকে থেকে মোনাজাতে কেঁদে উঠছেন বাবা পুতুলের জন্য।
মোনাজাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। খাবার তদারকির ভার পড়েছে আমার ওপর। সারা দিন আমৃত্তি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। শরীরে, কাপড়ে লেগে আছে মিষ্টি রস। দু-একটা পিঁপড়াও ঢুকেছে কাপড়ের ভেতর। জায়গা-বেজায়গায় কামড়াচ্ছে কুটকুট করে।
মোনাজাত শেষ হতেই তবারকের জন্য হামলে পড়ল লোকজন। গ্রামের ছয়-সাতটা যুবক ছেলে করছে খাবার বিলি-বণ্টনের কাজ। এত মানুষ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে তারা।
এত সব হুড়োহুড়ির ভেতর বড় ভাইজানকে প্রথম দেখতে পায় পশ্চিম পাড়ার সুলতান মাঝির ছেলে আইয়ুব।
সবার হাতে হাতে আমৃত্তি তুলে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ছেলেটার। হাসি হাসি, ক্ষুধার্ত মুখ নিয়ে আমৃতির জন্য হাত পাতা মানুষগুলোর ভিড় হতে জলভরা

চোখে আমৃত্তির জন্য দাঁড়ানো একজনকে আলাদা করে ঠাওর করাটা আইয়ুবের জন্য কঠিন হয়নি ।
ভাইজানকে দেখতেই তাকে জড়িয়ে ধরে 'ভাইজান । ভাইজান আইছে গো । আইছে... ।' বলে চিৎকার করতে থাকে সে । ততক্ষণে আমিও দৌড়ে এসে জাপটে ধরি ভাইজানকে ।
কত দিনের পুরনো ভালোবাসার ভাইজানটা আমার! কত দিন, কত দিন পর ভাইজানকে কাছে পেলাম ।
খবর শুনে দৌড়ে আসে মুরব্বিরা । বাবা এসে দাঁড়ান ভাইজানের সামনে । পালানোর চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারেন না ভাইজানটা ।
চোখভর্তি জল তার । পুতুলের জন্য কি কাঁদছেন? বোনকে তো বেশিদিন কাছে পায়নি । তাহলে কেন এই মায়া! কেন এই কান্না!
ভাইজানের মায়া বরাবরই একটু বেশি । তবে আজ তিনি কেন সবাইকে না জানিয়ে এখানে এসে আবার চলে যাবার চেষ্টা করলেন তার কারণ বোঝা গেল না !
মা, বাবা ভাইজানকে অনেক আগেই ক্ষমা করেছেন । আমারও নেই ভাইজানের ওপর কোনো রাগ । এমন ভালো মানুষের ওপর রাগ করা যায় না । যতই খারাপ কাজ করুক না কেন, একদমই রাগ করা যায় না ।
'কাঁদিস না । চল, বাড়ি চল ।' বাবা এগিয়ে এসে ভাইজানের কাঁধে হাত রেখে বললেন কথাগুলো ।
বড় শান্ত, ধীরস্থির এ মুহূর্তে সে ।
'যাও বাবা । বাড়ি যাও । মাইনষের জীবনে ভুল হইবারই পারে ।' বাবার কথার পর মুরব্বিদের ভেতর থেকে ভাইজানকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলল কেউ একজন ।
কারো সাথে কথা না বলে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল ভাইজান আচমকা । কোনো দিকেই খেয়াল নেই যেন এখন । তার পেছনে রাজ্যির মানুষ । তাদের হাতভর্তি আমৃত্তি ।

তবে এ মুহূর্তে দারুণ সুস্বাদু এই খাবারটির কথা ভুলে গিয়েছে অথবা এড়িয়ে যাচ্ছে সবাই। কালিশুরি বাজারে গিয়ে পয়সার বিনিময়ে এমন ঢের আমৃত্তি খাবার সুযোগ পাবে কিন্তু এমন নাটক তো আর দেখতে পাবে না তারা সচরাচর। লোকগুলোর দোষ দিয়ে তাই লাভ নেই।

ভাইজানের পেছন পেছন হাঁটার সময় আমার মনে পড়ল নিশা আপার কথা। পুতুলকে দাফন করার দিনে জামাইকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। জামাই চলে গেলেও মায়ের সাথে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য থেকে গিয়েছেন বাড়িতেই । মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সাহায্য করছেন রান্নাবান্নায়। ভাইজানকে দেখে নিশা আপার কি অবস্থা হয় কে জানে!

ভয় লাগছে আমার। খুব ভয়। আবার না অঘটন ঘটে যায় একটা!

জানতাম ভাইজান আসবেন। আসবেনই।

সেই ছোটবেলা থেকে ভাইজান আর নিশা আপার সাথেই কেটেছে বেশির ভাগ সময়। আমরা তিনজন ছিলাম বন্ধুর মতো। আমি ছোট হলেও তিনজনের মাঝে ছিলাম সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। নিশা আপার মা মারা যাবার পরই তিনি আমাদের বাড়িতে এসে থাকা শুরু করেন।

আমার এখনো মনে আছে, দুপুরের দিকে এক দিন তার বাবা তাকে মারতে মারতে আমাদের বাড়ির উঠোনে এনে ফেলে বলেছিলেন, 'এই নাও। তোমগো মাইয়া তোমরা পালো। এই বজ্জাত মাইয়া নিয়া বসবাস করা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

নিশা আপা কান্না ছেড়ে তখন হাসা শুরু করেছেন। পাগলের মতো হাসি। তখনই বুঝেছিলাম আমার খালাতো বোন এই মেয়েটার মাথায় সমস্যা আছে। কঠিন সমস্যা।

নইলে এমন কারণ ছাড়া হাসা-কাঁদা স্বাভাবিক মানুষের কাজ নয়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে অবস্থায় সে মাকে বলে, 'খালা, ভাত দেও। খিদা লাগছে। দুধ আর গুড় দিয়া ভাত খাইতে ইচ্ছা করে।' আমি ওই মুহূর্তেই চিকনচাকন, শ্যামলা দেখতে পচা চেহারার পাগলি নিশা আপাটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। শুধু আমিই না। আমরা দুই ভাই !

আমি বুদ্ধিমান বলে আমার ভালোবাসার কথাটা নিশা আপা কোনো দিনই জানতে পারেনি। তবে ভাইজানেরটা বুঝতে পেরেছিল। সেদিনই।
তাই তো ভাত খাওয়ার জন্য মায়ের সাথে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার সময় তাকে ধমক দিয়ে বলছিলেন, 'ওই ছেড়া, অ্যামনে ড্যাব ড্যাব কইরা দেকবি না আমারে। চোখ গাইলা দিমু। আর খবরদার প্রেমে পইড়বি না। একদম না।'
ভাইজান নিশা আপার কথা শুনে ভয় পেয়েছিলেন। তবে সেই ভয়ের সাথে মেশানো ছিল ভালোবাসা। অনেক অনেক ভালোবাসা।
নিশা আপাকে এ মুহূর্তে লুকিয়ে ফেলার কোনো উপায় নেই। তার পরও কিছু একটা করতে হবে। কিছু একটা।
আমি দ্রুত পা চালালাম। অন্য পথ ধরে ভাইজানের আগেই পৌঁছাতে হবে বাড়ি।
ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে, কাঁচা ধানক্ষেত পেরিয়ে ছুটলাম। মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। অনেক বছর পর ভাইজান এসেছে বাড়িতে। নিশা আপার জন্য তাকে আর হারাতে চাই না আমি।
তবে শেষ রক্ষা হলো না। বাড়ির সামনে আসতেই চোখে পড়ল উঠোনের ভিড়। রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছেন মা। হাতে লেগে আছে কাঁচা হলুদ।
একটানা দৌড়ের পর হাঁপাচ্ছি আমি। ভিড় ঠেলে ভাইজানের পাশে গিয়ে দাঁড়াব সে ইচ্ছে নেই একদম। পরিবারের এই আবেগঘন মুহূর্তে একটু দূরে থাকাই নিরাপদ।
মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন নিশা আপা। বড় আবেগী এই মেয়ে। কী করে বসে এখন কে জানে!
উপস্থিত জনতা তাকিয়ে আছে আপার দিকে। তার জীবনের গল্প এ এলাকার সবারই জানা। সবাই-ই চাচ্ছে কিছু একটা করুক নিশা আপা।
নাটকীয় কিছু একটা। নইলে এতটা পথ হেঁটে আসা বিফলে যাবে সবার।
নিশা আপা এগিয়ে এলেন ভাইজানের দিকে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মা। প্রচণ্ড জোরে চড় মারা হলো ভাইজানের গালে।

জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম এমন কাণ্ড দেখলাম। মা কখনো হাত তোলেন না ভাইজানের ওপর। এবারই প্রথম।
ভেবেছিলাম চড়টা মারবেন আপা। হলো উল্টোটা। চড় মারার সাথে সাথেই ভাইজানকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মা-টা।
সাথে তাল মেলানোর জন্যই যেন 'মা। ও মা।' বলে এতক্ষণে কাঁদা শুরু করল ভাইজান।
জনতার মন ভাঙল। অন্য কিছু হয়তো আশা করছিল তারা।
আফসোস করতে থাকা এই মানুষগুলোর মতোই এ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নিশা আপার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। অন্তত এবার হয়তো তিনি কিছু একটা করবেন।
কিন্তু নিশা আপা কিছুই করলেন না। কিছুই না। শুধু মায়ের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। নিশা আপার ব্যবহারে অন্যরা অবাক হলেও অবাক হলাম না আমি। কারণ নিশা আপা চুপ করে থাকার মেয়ে না। আজ না হলেও পরে কিছু না কিছু একটা করবেনই তিনি। করবেনই !

**৩.**

রোদ উঠেছে আজ। মিষ্টি রোদ। এমন মিষ্টি ওম ওম হলুদ রোদে ঘুম পায় খুব।
গতকাল রাতে জেগেছিলাম অনেকক্ষণ। তাই এই দুপুরবেলা ঘুমুলে কেউ কিছু বলবে না আমাকে। শুধু মা হয়তো একবার ঘরে এসে জানতে চাইবেন শরীর খারাপ কি না। জ্বর আছে কি না দেখার জন্য হাত দেবেন কপালে।
দুপুরের দিকে ঘুমুতে পারি না কখনো। যত রাতেই বিছানায় যাই না কেন সূর্য উঠার সাথেই ঘুম ভেঙে যায় ঠিক ঠিক।
তখন মাথায় ব্যথা হয় খুব। তীব্র যন্ত্রণায় হুঁশ লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা হয়। তবে আজ যন্ত্রণা হচ্ছে না। ঘুম না হলেও শরীরটা ঝরঝরে লাগছে বেশ।
সুতি কাপড়ের একটা জামা গায়ে চড়িয়ে বের হলাম বাইরে। কমলেশের আসার কথা আজ। ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। সেই ছোটবেলা থেকেই এই বন্ধুটি

নিজেদের বাড়ির চেয়েও বেশি সময় কাটাত আমাদের বাড়িতে। এখনো কাটায়।
কিছুদিন হলো বিয়ে করেছে কমলেশ। তার পরও আমাদের বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি। এ নিয়ে অবশ্য ওর বউয়ের অনেক আফসোস।
প্রতিদিন একবারের জন্য হলেও আমাদের বাড়িতে আসা চাই-ই চাই। সকালের দিকে রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের কাছে মুড়ি ভাজা, কাঁচা চাল কিংবা তরকারির ঝোলে লুকিয়ে থাকা আলুর জন্য হাত না পাতলে দিনটা নাকি মাটি হয়ে যায় গাধাটার। শুধু কাঁচা চাল চিবোতে চিবোতেই পুরো একটা দিন পার করে দিতে পারে কমলেশ।
উঠোনে একটা মাদুর পেতে তার ওপর শুয়ে বই পড়ছেন ভাইজান। নিজের ঘরটা ঘেঁটে পুরনো কোনো গল্পের বই খুঁজে পেয়েছেন হয়তো।
গত আট বছরে কাউকে তার ঘরে ঢুকতে দেননি মা। ঝাঁট দিয়ে, ধুয়েমুছে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছেন এতগুলো দিন।
ভাইজানের পাশেই বসে আসে কমলেশটা। এলোমেলো কথা বলে বিরক্ত করছে ভাইজানকে।
'সকাল সকাল আইসা ঘুম থেকে উঠালি না ক্যান গাধা? গতকাইল না বললাম মাছ ধরতে যাব। এত বেলায় উঠলে মাছ ধরতে যাওয়ায় লাভ আছে কোনো? কোনো দিনই কি ঠিকমতো কাজ করতে শিখবি না তুই?' কমলেশের ঠিক অপর দিকে মাদুরের এক কোনায় বসে ধমক দিয়ে কথাগুলো বললাম আমি।
বাড়ছে রোদের তেজ। চারপাশের ধুলোর রং কেমন সাদাটে পাউডারের মতো হয়ে আছে। সেগুলো উড়ছে বাতাসে। ঝড় আসবে মনে হয়। আজকাল বড় হুটহাট করে ঝড় আসে!
'ঝগড়া করিস না তো। এমনিই মন মেজাজ ভালো নাই। ঝগড়া ভাল্লাগে না।' একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে জবাব দিল কমলেশ।
'ঝগড়া করলাম কই! শুধু প্রশ্ন করলাম কয়েকটা। জবাব দিতে ইচ্ছা না হইলে দিবি না। বিয়ের পর সব সময় মেজাজ খারাপ থাকে তোর। কাহিনী কি?'

‘দূর, বউডা খালি ঘ্যানর ঘ্যানর করে। খালি এক কথা, ‘সংসারে মন দেও। সংসারে মন দেও।’ আরে বাপ্, বিয়া কইরা মন তো দিছি বউরে। এক মন আমি কয়জনারে দিমু।’

ভাবার মতন বিষয়! হাসি চেপে চুপ হয়ে গেলাম।

তা ছাড়া কমলেশের দুঃখে সব সময় হাসি এমন অপবাদটা চাপা দেওয়ার জোর চেষ্টা করছি ইদানীং। আমি না হাসলেও ভাইজানটা ফিক করে হেসে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই হাসিতে তাল মেলালাম আমি আর কমলেশ।

‘আমাদের ছোট্ট কমলেশটা বিয়া করছে এটাই তো বিশ্বাস হয় না আমার। বোঝা যায় মন নিয়া তার জানাশোনা ভালো। আজব মন!’ হাসতে হাসতে বললেন ভাইজান।

‘বউ আমার মেয়ে ভালো ভাইজান। গায়ের রং আপেলের মতো।’ বেশরমের মতো নিজের বউয়ের প্রশংসাটা করল কমলেশ।

‘ঘটনা মিথ্যা না। মেয়ে আসলেই ভালো। সংসারের দিকে মন খুব। সংসারী মেয়ে।’ সুযোগ পেয়ে ভাইজানের কাছে বন্ধুর বউয়ের প্রশংসা করে নিলাম একটু।

বউকে নিয়ে ভালো কিছু বললে কমলেশ খুশি হয়। সামনের কয়েকটা দিন কমলেশকে খাটাতে হবে অনেক। এ মুহূর্তে তাই ওকে খুশি রাখা দরকার।

‘সামনে পূজা। পূজা পর্যন্ত থাকতে হইব কিন্তু ভাইজান। আপনের চাঁদা ধরছি। হুনছি আপনার এখন অনেক পয়সা।’

‘দেবো, চাঁদা দেবো।’ কমলেশকে কথাটা বলেই একটু চুপ হয়ে গেলেন ভাইজান। পূজা পর্যন্ত থাকবেন কি না সে বিষয়ে কিছু বললেন না।

‘ভাইজান, চলেন মাছ ধরতে যাই। পশ্চিম পাড়ার পুকুরটায় ভালো মাছ আছে বলে শুনেছি।’ মাদুর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আমি।

‘হুম। আমারে খুশি করার চেষ্টা। ভালো। খুব ভালো। চল যাই। মাছ ধরি না অনেক দিন হইল। বড়শিটড়শি কই?’

‘আনছি ভাইজান। আনছি।’ কথাটা বলেই দৌড়ে আমার ঘরের খাটের নিচ থেকে তিনটে ছিপ নিয়ে হাজির হলো কমলেশ। ঘুমের ভেতর কখন যে এসে

আজ এগুলো আমার ঘরে রেখেছে কে জানে। শালা চুরিচামারি করলে জীবনে শাইন করতে পারত। এমন ঘরের ভেতর শব্দ না করে বিড়ালের মতে হাটাচলা করাটা চোরদের জন্য বহু আকাঙ্ক্ষিত এক বিদ্যার নাম।

মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে পশ্চিম পাড়ার পুকুরটার দিকে হাঁটা শুরু করলাম তিনজন।

অনেকগুলো বছর পর আবার একসাথে। আমার খুশি হবার কথা। কিন্তু ভালো লাগছে না।

বুঝলাম, বোকাসোকা ভাইজানটা এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান। আমি তাকে খুশি করার জন্য মাছ ধরার আয়োজন করেছি এটা আগে হলে এত সহজে বুঝতেন না তিনি।

যাওয়ার আগে মা তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বললেন। হাঁসের মাংসের ঝোল দিয়ে চালের রুটি খেতে পছন্দ করেন ভাইজান। নিশা আপা আর মা সকাল থেকেই মাংস রান্নায় ব্যস্ত।

আপা তো টুকটুক করে শ-খানেকের মতো রুটি বানিয়ে ফেলেছেন! সবাই আনন্দে আছে। ভালো আছে। পুতুলের মৃত্যুর দুঃখ যেন মুছে যেতে বসেছে ধীরে ধীরে !

পুকুর ঘাটে তেমন একটা লোকজন নেই। নিরিবিলি দেখে একটা জায়গায় মাদুর বিছিয়ে বসে পড়লাম আমি আর ভাইজান। কমলেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেঁচো খোঁজার কাজে। ছোট্ট কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করল। অল্পক্ষণের ভেতরেই জোগাড় করে ফেলল নাদুসনুদুস, জঘন্য দেখতে ছয়-সাতটা কেঁচো। তারপর সেই কেঁচো গাঁথতে লাগল বড়শিতে। সাথে করে বাটিতে সামান্য ভাতও নিয়ে আসা হয়েছে। পুঁটি মাছ ধরার জন্য ভাত খুব ভালো টোপ হিসেবে কাজ করে।

একটু পর পর জলেতে ঘাই দিচ্ছে মাছগুলো। শোল মাছগুলো এ কাজে বেশি পারদর্শী। পেটে ডিম আসলেই নাকি ঘাই দেওয়ার দিকে মনোযোগ বেড়ে যায় তাদের। স্বভাবে ধূর্ত হলেও পেটে ডিম থাকলে সহজেই ধরা পড়ে যায় মাছগুলো।

মাছ সম্পর্কে আমার ধারণা কম। অল্প কিছু যা জানি সব কমলেশের কাছ থেকে শেখা। পশ্চিম পাড়ার এ পুকুরটায় মাছশিকারিদের খুব ভিড় হয়। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষণা দিয়ে ধরা হয় মাছ। আশপাশের কয়েক গ্রামের শিকারিরা জড়ো হয় মাছ ধরার জন্য।

'ছুটোবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ নিয়া বইসা থাকতাম এই পুকুরপাড়ে, মনে আছে?' আমাকে উদ্দেশ করে বললেন ভাইজান। দু হাত দিয়ে ছিপ ধরে বসে আছে সে।

'আছে। থাকব না ক্যান।'

'আমাগো চাইরজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি মাছ ধরত তোদের নিশা আপা। আর তাই দেইখে রাগ হতো খুব।'

'আপনার রাগ হতো না ভাইজান। আপনি মাছ ধরায় ছিলেন সবচাইতে ভালো। নিশা আপা কষ্ট পাবেন এ জন্য সব সময় তার চাইতে কম মাছ ধরতেন। জিতাইয়া দিতেন নিশা আপারে।'

কথাগুলো বলে চুপ হয়ে গেলাম। বুঝলাম কথাগুলো এ মুহূর্তে বলাটা ঠিক হয়নি। কষ্ট পেয়েছেন ভাইজান। মুখ দেখে বোঝা যায়।

নিজের ওপর খুব একটা নিয়ন্ত্রণ নেই আমার আজকাল। আবেগ সামলানো কষ্টকর হয়ে যায় প্রায়ই।

কমলেশটা চুপ করে আছে। কিছু একটা বলতে যেতেই ওকে ইশারা করলাম চুপ থাকার জন্য। আমাকে অবাক করে দিয়ে কমলেশ ইশারার মানেটা বুঝল। চুপ করে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে কেঁচো ধরা শুরু করল আবার।

'কেমন আছে নিশা?' জলের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে প্রশ্নটা করলেন ভাইজান। দেখেই বোঝা যায় ভয়াবহ অপরাধবোধে ভুগছে সে।

'আপারেই জিজ্ঞেস কইরেন।' ভাবলেশহীনভাবে বললাম আমি।

'সবাই আমার ওপর রেগে আছিস অনেক, তাই না?'

এ প্রশ্নের জবাব দিলাম না। দিতে ইচ্ছে করল না। প্রশ্নটা শুনেই রাগ হলো খুব। পুরো একটি পরিবারকে শেষ করে দিয়ে এতগুলো বছর পর এমন ফালতু

প্রশ্ন করার মানে হয় না। প্রশ্নটা উপহাসের মতো মনে হয়। আপাকে এই প্রশ্ন করা হলে হয়তো ভাইজানকে খুনই করে ফেলতেন!
নিশা আপার মতিগতির ঠিক নাই। ভাইজান চলে যাবার পরপরই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।
নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেওয়ার আগে আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোর ভাইজানরে ঘৃণা করি। একটা মানুষরে যত ঘৃণা করা যায় তার সব, সব ঘৃণাই করি। সামনে যদি তারে এখন পাইতাম, চোখখান গাইলা দিতাম। সেই চোখ যেই চোখ দিয়া ড্যাবড্যাব কইরা দ্যাকত সে আমারে সারা দিন। সারা দিন। দূর তোর মতো ছুটো মানুষরে এইসব কী বলতাছি। যা, যা ফুট।'
আপা সব সময়ই আমাকে তাড়িয়ে দিতেন। কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। আমি ছোট ছিলাম এটাই আমার দোষ।
ছোট হলেও আমি বড়দের মতো করে বুঝতাম। সব বুঝতাম। আপার এলোমেলো কঠিন কথাগুলো বুঝে তাকে আরো ভালোবাসতাম। ভাইজানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি নিশা আপাকে। অনেক অনেক বেশি। কিন্তু আফসোস, আপা এই ভালোবাসা বুঝল না! ছোট বলেই ছোট মানুষের ভালোবাসাটা বোঝার চেষ্টা করল না।
আমি তাই শৈশবে বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছি। করছি। আমার অপেক্ষার পালা ফুরোয় না। কখনো ফুরোবে বলেও মনে হয় না!
'নিশার চোখে সব সময় কাজল থাকত। বলত নিজের মেয়ের চোখেও সব সময় কাজল মাখিয়ে রাখবে সে। একদম পাগল ছিল মেয়েটা।' আপনমনে কথাগুলো বলে হাসতে লাগলেন ভাইজান।
'আপা এখন আর কাজল দেয় না।'
'জানি সব দোষ আমার। পাপ আমার। সবাই দোষী ভাবে আমারে। কিন্তু কেউ কোনো দিন আমার নিজের কষ্টের কথা জানতে চাইল না। জিজ্ঞেস করল না ক্যান্ আমি এমন করছি। জানিস, তোদের নিশা আপাটা কাজল লাগাইত বলে আমার মেয়েটার চোখেও সব সময় কাজল দিয়া রাখতাম। মেয়েটা যেদিন মারা যায় অই দিনও চোখে কাজল ছিল। কী যন্ত্রনাই না দেখছিলাম কাজলমাখানো

চোখে। জীবনের শেষ কয়টা দিন একবারের জন্যও বাবার কোলে আসে নাই। ভয় পাইত আমারে। অচেনা ছিলাম আমি। আমারে দেখলেই দিত ভয়ে চিৎকার। কী কষ্ট। কী কষ্ট। বাপ হইলে বোঝা যায়। আমি বুঝছি। শোন, এইসব কথা কাওরে বলবি না তুই। নিশারে তো একদমই না। বুঝছস্?'
এতগুলো কথা বলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন ভাইজান। হাঁপিয়ে গেছেন।
আমি আড়চোখে ভাইজানের দিকে তাকালাম। দেখতে লাগলাম তাকে। এমন কষ্টের কথা বলার পরও চোখের কোথাও জমা হয়নি লোকটার এক টুকরো জল। কী জানি, জল হয়তো নেই এখন আর তার চোখে।
তবে ভাইজানের মেয়েটা কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে হলো তা আমার। নাক কেমন ছিল, চোখ কেমন ছিল, কেমন ছিল গায়ের রং, কিভাবে কথা বলত, আমার ভাইজানকে কিভাবে বাবা বলে ডাকত–সব সব সব জানতে ইচ্ছে করল হঠাৎ।
কিন্তু জানা হলো না। কমলেশের চিৎকারে আচমকা চাপা পড়ে গেল সব। 'পাইছি রে মাছ, মাছ। পাইছি।' বলে চিৎকার করে লাফাতে লাগল সে। চোখে পড়ল তার হাতে ধরা ছিপটির বড়শিতে গাঁথা মাগুর মাছটিকে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মাছটি।
শেষ বিকেলে পুকুরের একদিকে হেলে পড়েছে সূর্যের আলো। গাছের পাতায় পাতায় চলছে কেমন একটা মায়া মায়া রোদ আর ছায়ার লুকোচুরি খেলা। সামান্য রোদের তেজে পুকুরের জলের আয়নায় কাতরানো মাছটির শরীর দেখতে লাগলাম আমি।
আমারও এই মাছটির মতো অবস্থা। অনেক অনেক ওপরে থাকা ক্ষমতাবান কেউ একজনের ছিপের বড়শিতে আটকা পড়ে গিয়েছি। আটকা পড়ে কাতরাচ্ছি ভয়ংকর যন্ত্রণায়। বড়শি থেকে ছোটার কোনো উপায় নেই। একমাত্র জীবননাশ হলেই মিলবে মুক্তি। তবে তার জন্য করতে হবে অপেক্ষা। ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষা।

**৪.**

পুতুলের কবরের চারপাশে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে আজ।
চারপাশটা করা হয়েছে পরিষ্কার। কয়েক দিন আগে মেয়ের কবর জিয়ারত করতে এসে বাবার মনে হলো ছোট্ট মেয়েটি এমন জায়গায় থাকতে ভয় পাবে। আগাছা, বুনো পোকামাকড়ে ভরা. দিনের বেলায়ও অন্ধকার হয়ে থাকে এমন একটি জায়গা তার মেয়ের পছন্দ হতে পারে না। তাই তো জিয়ারত শেষে কান্নারত কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'বাবা রে, লোকজনরে খবর পাঠাও। এই জায়গায় মেয়ের থাকতে কষ্ট হয়। যত তাড়াতাড়ি পারো কবর পরিষ্কারের কাজ শুরু করো।'
কান্না পুরুষ মানুষের সাথে যায় না। এসব মেয়েছেলের ব্যাপার। তারা যত কাঁদবে চোখ তাদের তত পরিষ্কার হবে। সুন্দর হবে। জলেতে গলে তাদের চোখের কাজলে যখন পুরো মুখ মাখামাখি হবে তখন প্রিয় পুরুষটির বুকে হাহাকার শুরু হবে। ভালোবাসা আর কাছে পাওয়ার হাহাকার।
কিন্তু বাবার কথা ভিন্ন। তিনি কাঁদলে মন ভালো হয়ে যায়। ইচ্ছে হয় সাধু-সন্ন্যাসীর মতো দেখতে এই মানুষটির কাছে নিজের সব লুকোনো পাপের কথা বলতে। একটু আশ্রয়ের জন্য, মন খুলে নিজের কথাগুলো বলার জন্য বাবা ছাড়া অন্য কারো কথা চিন্তাই করা যায় না।
তবে লুকোনো পাপের কথা বাবাকে বলব এতটা বোকা আমি নই। মনের ভেতর যতই আকুলিবিকুলি হোক না কেন, বাবার কাছ থেকে সব সময়ই চেষ্টা করি দূরে থাকার।
বাড়ির সদর দরজা লাগোয়া রেইনট্রি গাছটার নিচে বিছানার চাদর পাতা হয়েছে। ভরদুপুরেও ছায়া ছায়া শান্তির একটা পরশ চারপাশে। গোটা সাতেক লোক খেতে বসেছে।
কবর পরিষ্কার করার মজুরি দেওয়ার পরও মা সবার জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।
খাওয়া শেষে তার নাতনি আর পুতুলের জন্য দোয়া হবে। নাতনির মৃত্যুর কথা শুনেছেন তিনি। ভাইজানের কথা না শুনে আমি সবাইকে বলে দিয়েছি।

মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বলেননি ভাইজান। তাকে এসব নিয়ে ঘাঁটাবে এমন সাহস নেই কারো। তবে মা বরাবরের মতো নিয়ম করে একদুপুর কাঁদলেন।

বিলাপে পুতুলের সাথে যোগ হলো নাতনির শোক। 'ওরে পুতুল, ওরে আমার নাম না জানা, চেহারা না দেখা কইলজার টুকরা নাতনি, তোগের আগে ক্যান গেলাম না আমি। দয়াল ক্যান এত দুঃখ দিল আমারে। মইরবার চাই আমি। মইরবার চাই।' এমন সব কথা বলে মা যখন কাঁদছিল তখন আমার হাসি পাচ্ছিল খুব। মা পারেও!

দুপুরের আয়োজনে রয়েছে আতপ চালের পোলাও আর ডিম ভুনা।

গরিব লোকগুলো অনেক দিন পর খাচ্ছে পেটপুরে। ডিমের ঝোলে ঝাল হয়েছে খুব। একটু পর পর লোকগুলোর পানি খাওয়া দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। যাদের সর্দি আছে তারা ঝালের কারণে শোস্ শোস্ শব্দ করে সর্দিটুকু টেনে নিচ্ছে নাকের একদম ভেতরে। একটু পরই আবার নাকের ডগায় ফিরে আসছে সে সর্দি। গভীর সাদাটে হলুদ ছোট্ট বেলুনের মতো ঝুলে থাকছে নাকের সাথে। সিকনি ঝাড়ার সময় নেই কারো। এত ভালো খাওয়াদাওয়ার সময় এসব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। মাথা ঘামালে সৃষ্টিকর্তা নারাজ হন।

খাওয়া শেষ হওয়ার একটু পরই পশ্চিম পাড়ার ছেলে আইয়ুব এসে জানাল, নদীর পাড়ে ট্রলার এসে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা ব্যবসার কাজে কালিগুরি যাবেন। সেখানকার বাজারে দুটো দোকান আছে আমাদের। প্রতি মাসে একবার লাভ-লোকসানের খবর নিতে বাবা যান সেখানে।

ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝি না। তাই তো সাথে করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই বাবাকে বললাম, 'কমলেশরে নিয়া যান। আমার কাজ আছে। জরুরি কাজ।' বাবা কমলেশকে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না। বিধর্মীদের তিনি পছন্দ করেন না। তা ছাড়া আমার মতো বেকারের কোনো জরুরি কাজ থাকতে পারে না। তাই যেতেই হবে।

অনেক দোনোমনো করেও পার পেলাম না। কমলেশের ওপর রাগ হলো খুব। বেচারার কোনো দোষ নেই। তার পরও কিছু একটা হলেই ওর ওপর রাগ হয়। কবরস্থান পরিষ্কার করা হয়েছে আজ, এ খবর পেয়েছে কমলেশ। সাপেতে তার দারুণ ভয়। পরিষ্কার করার সময় পুরনো কবরগুলো থেকে লিকলিকিয়ে বের হয়েছে সাপ। একটিও মারা হয়নি। কবরস্থানের সাপ মারার নিয়ম নেই। এতে ঘোরতর পাপ।

সাপগুলো যেকোনো সময় আমাদের বাড়িতে হানা দিতে পারে–এমন ধারণা কমলেশের। সাপেতে কোনো বিশ্বাস নেই তার। রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহ এ বাড়িমুখো হবে না সে। তবে ঘোষণায় লাভ নেই। যতই যাই-ই হোক না কেন এ বাড়িতে তাকে আসতেই হয়। না এসে থাকতেই পারে না উজবুকটা।

ট্রলার ছাড়তে দেরি করল না আইয়ুব। সন্ধের আগে আগেই বাড়ি ফেরার ইচ্ছে। আকাশের অবস্থা এখন হুটহাট করে খারাপ হয়।

তা ছাড়া জলপথে ডাকাতির পরিমাণটাও বেড়েছে খুব। রাত নামলেই ভয়।

ট্রলার স্টার্ট দিতেই আমার পাশে এসে বসলেন বাবা। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কথা শুরু করলেন।

'আসরের নামাজটা গিয়া পামু বইলা তো মনে হয় না। কী কস তুই?'

'পাবেন। আর না পাইলে ট্রলারেই তো নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে।'

'হ তা আছে।' কথাটা বলে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে উশখুশ করতে লাগলেন বাবা।

'কিছু বলবেন?'

'না, না, কী বলব। তেমন কিছু না। তোমার ভাইজান যাওনের কথা কি কিছু কয়?' কাঁধের গামছাটা বিছিয়ে তার ওপর আয়েশ করে বসে কথাটা বললেন বাবা। তার সফেদ দাড়ি এ মুহূর্তে উড়ছে বাতাসে।

'না তো। তেমন কিছু বলে নাই।'

'বউ রাইখা আইছে কই?'

‘এই বিষয়েও জানি না। ভাইজান খালি বই পড়ে, ঘুমায় আর মাঝে মাঝে উঠানে মাদুর পাইতা বইসা থাকে। কারো সাথে তেমন কথাবার্তা তো কয় না।’
‘এমনে তো চলতে দেওন যায় না বাবা। তারে জিগাও কী হইছে তার। জীবন তো থাইমা থাকে না। প্রয়োজনে নতুন কইরা জীবন শুরু করব। তারে বিয়া দিমু আবার। এমুন বেশি বয়স তো হয় নাই। আর শুনো, নিশারে বিদায় করো। তার জামাইরে খবর দেও। এই মাইয়ারে এই সময় বাড়িতে রাখন ভালো না।’
কথা থেমে যায় এরপর। বাবা চুপ করে দেখতে থাকে হাত দশেক দূরের নদীর পাড় আর পাড়ের মানুষগুলোকে।
কুমারখালী নদী পার হচ্ছে এই মুহূর্তে ট্রলারটা। জোয়ারের সময় এখন। ঢেউ খুব নদীতে। দুলতে দুলতে সামনের দিকে এগোতে থাকে ট্রলারটা।
একটা বাটিতে সামান্য মুড়ি আর কয়েক টুকরা গুড় এনে দিয়ে যায় আইয়ুব। আমি আর বাবা বসে বসে চিবোতে থাকি। গান ধরে আইয়ুব। হেঁড়ে গলায় গাওয়া গান।

‘ ওরে, রইবে না আর ঘরে রে মন, রইবে না আর ঘরে।
পরানখানি দিবে উড়াল, নিরালা এক চরে রে মন,
রইবে না আর ঘরে...।’

গান শুনে মন খারাপ হয়। নিশা আপার জন্য মন খারাপ। আপাও গাইত। দারুণ গলা ছিল তার। ‘ লোকে বলে কালো, কালো/ আমি বলি চান্দের আলো/ আমার কাছে তারে লাগে সবার চাইতে ভালো।’ গানটা যখন গাইত তখন মনে হতো ধারালো ছুরি দিয়ে কেউ যেন কলিজায় আঁচড় কাটছে।
কি অদ্ভুত সুন্দর মায়াবী কণ্ঠ ! এই মেয়েটা, নিশা আপাটা কখনো কারো কাছ থেকে আদর পেল না। আমরা দুই ভাই ছাড়া আর কেউ তাকে ভালোবেসেছে বলে মনে পড়ে না। একটা মেয়ের বড় শখ ছিল বাবার। কিন্তু নিশা আপা সে শখ মেটাতে পারেনি।

বাবা শুধু নিজের রক্তেই বিশ্বাসী। তাই নিশা আপাকে কখনো আপন ভাবেনি সে। কখনো কাছে ডেকে বলেননি, 'মা, তোমার কী লাগবে কও। বাজার থাইকা নিয়া আসবোনে।' এসব নিয়ে মনও খারাপ থাকত আপার।
আমরা যখন বিকেল বেলা আলগী নদীর তীরে বসে কাশের আগা চিবোতে চিবোতে ময়ূরকণ্ঠী নীল আকাশটা দেখতাম তখন আপা প্রায়ই বলতেন, 'হ্যারে, তোর পোষা রাজহাঁসগুলোর ভেতর একটা দিবি আমারে? রাজহাঁসের পিঠে চইরা শহরে চইলা যামু। তোগের সাথে থাকতে ভালো লাগে না আর।' আমি তো রাজহাঁস দেবার জন্য দুই পায়ে খাড়া। কিন্তু শর্ত একটা, আমাকেও নিতে হবে সাথে।
আমার মতো পুঁচকে কাউকে সাথে নিতে নারাজ নিশা আপা। তাই তাকে কখনো রাজহাঁস দিইনি আমি আর তারো আমাদের ছেড়ে শহরে যাওয়া হয়নি। মাঝখান থেকে চিরদিন গ্রামে থাকার জন্য পাগল ভাইজানটা চলে গেল শহরে। এমনই চলে যাওয়া যে আর পুরনো ভাইজানটাকে পেলাম না ফিরে। ফিরুক, চাইওনি অবশ্য তখন। এমন জঘন্য, নোংরা পাপের পর কারো আর ফেরাটা মানায় না। একদমই মানায় না। আর ভাইজানটা না ফিরলে তখন সবচেয়ে বেশি লাভ ছিল আমারই। আমার।

**৫.**

হাত-পা মুড়ে হাঁটু 'দ' করে ঘুমাচ্ছে ভাইজান। গতকাল জেগে ছিল সারা রাত। নিজের ঘরের জানালা দিয়ে রাতের আঁধারে আবছায়াভাবে দেখেছি উঠোনে পায়চারি করছে লোকটা।
কোনো একটা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তার নির্ঘুম রাত কাটানো হয়তো!
এখন বিকেল। আকাশে ম্যাড়ম্যাড়ে আলো দেওয়া সূর্যের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে কতগুলো কচি মেঘ। তাদের সাদাটে শরীরের ওপর পড়েছে লালচে আলোর আভা।
সুন্দর। দারুণ সুন্দর।
তবে এতসব সৌন্দর্যের ভেতর একটা বেরসিক কালো মেঘ লেপটে থাকার চেষ্টা করছে সাদা মেঘগুলোর সাথে।

পাগলাটে কবির মতো প্রকৃতির এতসব ব্যাপার খেয়াল করতে করতেই মনে পড়ল, ভাইজানকে ঘুম থেকে উঠাতে হবে।
সকাল সকাল ঘুমোতে যাবার আগে বলেছিলেন আমাকে নিয়ে জনতার হাটে যাবেন। ঘণ্টা চারেক ঘুমানোর পর ঘুম যেন ভাঙিয়ে দিই। কিন্তু লোকটার ঘুমন্ত, ক্লান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে ঘুম ভাঙানোর ইচ্ছে হয়নি আর।
ঘুমোক আরো কিছুক্ষণ। সন্ধের আগেআগে ঘুম ভাঙাব।
একটা বাটিতে করে সিদ্ধ চালতা আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে গেলেন নিশা আপা। মুখটা থমথমে এ মুহূর্তে। গতকাল আপার জামাই জহর ভাইয়ের কাছে লোক পাঠানো হয়েছে। তাড়াতাড়ি এসে আপাকে নিয়ে যেতে বলেছেন বাবা।
খবরটা শোনার পর থেকেই রেগে আছেন তিনি। তবে মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই রাগের কথা। শুধু আমি বুঝি। কেন জানি মনে হয় নিশা আপার সব, সব কিছুই আমার জানা। তার মনের পানাপুকুরে কখন কী ঘটে বা ঘটবে, সব যেন আগে থেকে বলে দিতে পারি।
'পড়াশোনা কি ছাড়ানই দিলি?' আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মরিচের গুঁড়া দিয়ে চালতা মাখিয়ে খেতে খেতে কথাগুলো বললেন আপা।
'হুম। আর কত! ভাল্লাগে না বইপত্তর নিয়া সময় কাটাইতে।'
'কাজটা ঠিক হয় নাই। পড়াশোনাটা করা দরকার।'
'যে কথাটা বলতে আসছেন, বইলা ফালান আপা। আমি কী করি, কেমন আছি এসব নিয়া আপনার আগ্রহ নাই, আমি জানি।'
'মানে কি?'
'মানে কিছু না। শোনেন আপা, ভাইজান আসার পর কিছুই বলে নাই আমারে। তার বউ কই আছে, বাচ্চাটা ক্যামনে মারা গেল, কবে যাবেন, যাওয়ার পর বউ নিয়া কই থাকবেন এসব কিছুই জানি না আমি। কিছু জানতে চাইলে ভাইজানের সাথে আপনার নিজেরই কথা বলা উচিত।'
'মরিচের গুঁড়ার সাথে চিনি মাখাইয়া দিমু। খাবি?' আচমকা প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন আপা।

‘দেন। চিনি ছাড়া এই অখাদ্য খাওয়া সম্ভব না।’ কথাগুলো শোনার পরও নিশা আপাকে উত্তেজিত না হতে দেখে ভালো লাগল।
‘তোর কাছে এইগুলা আগে অখাদ্য ছিল না। তুই বড় হইয়া গেছস।’
‘তা তো কিছুটা হইছি। আচ্ছা আপা, ভাইজানরে আর যাইতে না দিলে কেমন হয়? ধইরা বাইধা চলেন রাইখা দেই তারে।’ কথাটা ইচ্ছে করেই বললাম। আপার মনের ভেতরের চিন্তাভাবনাটা একটু আঁচ করার চেষ্টা আর কি!
‘মনে আছে, তোর ভাইজানের হাত-পা বাইন্ধা চালের ড্রামের ভিতর ভইরা রাখছিলাম একবার।’ কথাটা বলে একটু হাসল আপা।
আমার কথায় তেমন কোনো ভাবান্তর হলো না তার। কথার পিঠে তাই অন্য কথা বলল বুদ্ধিমান আপাটা।
‘হুম। আমি, আপনি আর কমলেশ। ভাইজান পরীক্ষায় ফার্স্ট হইছিল আর আমরা সবাই ডাব্বা মাইরা বাড়িতে মাইর খাইছিলাম। ভাইজানের ফার্স্ট হওয়ার গুরুতর অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ভাবনাটা আপনার মাথা দিয়াই আসছিল।’ কথাটা বলে একটু জোরে জোরেই হাসতে লাগলাম আমি।
‘তোর ভাইজানরে সেইবার আটকাইয়া রাখতে পারছিলাম ঠিকয়ই; কিন্তু এইবার পারব বইলা মনে হয় না। তুই থাক, আমি মরিচের গুঁড়াতে চিনি মাখাইয়া নিয়া আসতেছি।’ কথাটা বলেই চলে গেল নিশা আপা। তার চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা ভালো লাগল না আমার। সতেজ অথচ চোখ-মুখের আড়ালে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকা ভয়ানক এক কাঠিন্য আঁচ করতে পারছি আমি।
ভাইজানকে নিয়ে কোনো একটা ফন্দি তিনি এঁটেছেন নিশ্চিত। তার সব বুঝতে পারলেও ফন্দিটার ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।
সময়ের সাথে সাথে কাছের মানুষগুলো জটিল হয়ে উঠেছে। তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি বদলাইনি বলেই হয়তো সব কিছু ধাঁধার মতো লাগে এখন।
সন্ধের ঠিক আগে আগে নিজ থেকেই ঘুম থেকে উঠলেন ভাইজান। বৈঠকখানার পাশে নতুন বসানো টিউবওয়েলের পানিতে চোখ-মুখ ধুয়ে নিলেন।

সময় নিয়ে খেলেন চা আর মুড়ি। তারপর খাওয়া শেষে আমাকে বললেন, 'সাথে করে দুই ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে নিস। ফিরতে রাত হবে।' তার কথামতোই কাজ করলাম।

চারপাশের আলো নিভে যেতে সময় লাগল না বেশিক্ষণ। মস্ত একটা চাঁদ উঠল আকাশে আর তাকে ঘিরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল তারারা।

দারুণ পরিষ্কার আকাশ। রাত নামলেও পথ দেখে দেখে হাঁটা যায়।

ফকফকা সব।

তবুও টর্চ জ্বালালাম। সাপের উপদ্রব বেড়েছে আবার। সাপগুলোর সাহস এতই বেড়েছে যে মানুষদের থোড়াই কেয়ার করে তারা হুটহাট করে রাস্তা পেরোয়। টর্চটা জ্বালিয়ে সাপ তাড়ানোর জন্য হুশ হুশ শব্দ করে জনতার হাটের দিকে যেতে থাকি আমরা।

হাটে নাকি জরুরি কাজ ভাইজানের। ফোনের দোকান থেকে দেশের বাইরে জরুরি একটা খবর জানাতে হবে। এর বেশি কিছু আর বলেননি তিনি।

হাটের কাছাকাছি আসতেই শুনতে পেলাম মিছিলের আওয়াজ। রাতের বেলায়ও মিছিল হয় আজকাল।

সামনে নির্বাচন। আগের মেম্বারকে সালিসি করতে যাওয়ার সময় নির্জন পথে কারা যেন কুপিয়ে মেরে ফেলেছে। তাই তড়িঘড়ি করে হচ্ছে নির্বাচন।

সকাল, বিকাল ও রাত সব সময়ই জমজমাট হয়ে থাকে এখন জনতার হাট। 'তোবারক ভাই, তোবারক ভাই...তোবারক ভাইয়ের জুড়ি নাই।', 'সিল মারেন ভাই...সিল মারেন...হারিকেন মার্কায় সিল মারেন।' এসব স্লোগান আর মানুষের ভিড় এড়িয়ে ঢুকে পড়লাম 'গিয়াসউদ্দিন নবীন সংঘ' ক্লাবে।

ক্লাবে বসে তুমুল আড্ডা মারছে লোকজন। গরম গরম পিঁয়াজু খেতে খেতে নির্বাচন নিয়ে ফোটাচ্ছেন কথার ফুলঝুরি। কমলেশও এদের মাঝে একজন। পিঁয়াজু খাচ্ছে আর মাথা দুলিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে লোকজনদের কী যেন বোঝাচ্ছে সে। মাথা মোটা লোকগুলো রাজনীতিতে ভালো করে। কমলেশের ভবিষ্যৎ ভালো বলেই মনে হচ্ছে।

ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদ কমলেশকে বিরক্ত না করে ক্লাবের ভেতরের ঘরে রাখা ফোনটার দিকে এগিয়ে গেলাম। পুরো গ্রামে শুধু এখান থেকেই দেশের বাইরে ফোন করা যায়।

আগের মেম্বার ব্যবস্থা করেছেন এমন। অল্প টাকায় লোকজন প্রবাসে থাকা আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলতে পারে এই জায়গায়।

ভালো কাজ। মেম্বার লোক ভালো ছিলেন সন্দেহ নেই তাতে।

ফোন করতে গিয়েই ভাইজান আমাকে বাইরে যেতে বললেন। জরুরি কথা তার। আমার না শোনাই নাকি ভালো।

অবাক হলেও কিছু বললাম না। ক্লাবের বাইরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েকটি দোকানে গরম গরম জিলাপি ভাজা হচ্ছে। হ্যাজাক লাইটের আলোর নিচে বসে জিলাপি বানাচ্ছে কারিগররা। একটা দোকানের কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম কারিগরদের হাতের কারুকাজ।

'কী রে, আইচস কহন?'

কথা শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম কমলেশকে। তবে তার কথার জবাব দিলাম না। এই মুহূর্তে জিলাপি মুগ্ধ করে রেখেছে আমাকে।

'চাচাজানের সাথে একটু কথা কইতে হবে। ক্লাব নিয়া ঝামেলা আছে। রাজনীতির ব্যাপারস্যাপার আর কি। আগের মেম্বারের ভাতিজা তলব করছে। ক্লাব তো চাচার ভাইয়ের নামে। নির্বাচন নিয়া তাই তার বিরাট দায়িত্ব।'

'কথা ক। মানা করছে কে।' একটু রেগে আর বিরক্ত হয়ে কথাটা বললাম আমি। এখন এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। ভাইজানেরও ফোনে কথা বলা শেষ হচ্ছে না। এতক্ষণ ধরে কী কথা বলছে কে জানে!

'চাচাজান যাত্রাপালায় আছিল এ ব্যাপারটা নিয়া আলোচনা হইল আইজ খুব। আমি কইছি পুরান জিনিস টাইনা লাভ নাই। সম্মানিত মাইনষের সম্মানে এইসব কইয়া কালি দেওন ভালো না। চাচাজান যে দলরে ক্লাবে থাইকা ক্যাম্পেইন করতে কইব সেই দলরেই মাইনা নিতে হোবে। সাফ সাফ কথা আমার, কোনো রাজনীতি-ফাজনীতি না, চাচার ডিসিশনই ফাইনাল।' কথাটা বলেই একটা গরম

জিলাপি হাতে নিয়ে খেতে শুরু করল কমলেশ আর আমি ভাবতে লাগলাম ক্লাবটার কথা।

বাবা এই ক্লাবটা দিলেও এটা এখন এলাকার সবার সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। প্রতি নির্বাচনেই কোন প্রার্থী ক্লাবে বসে ক্যাম্পেইন করবে তা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। 'গিয়াসউদ্দিন নবীন সংঘ' ক্লাব আমার চাচার নামে করা।

একটাই মাত্র চাচা ছিল আমার। পর পর তিন কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার পর দাদাজান বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তার অঢেল সম্পদ। এই সম্পদ দেখাশোনার জন্য পুত্রসন্তান আবশ্যক।

তিনি তাই আবার বিয়ে করলেন। চন্দন নামের এক কিশোরী মেয়ে এলো তার ঘর করতে। দাদাজান কাজকর্ম বাদ দিয়ে সারা দিন এই মেয়েকে নিয়ে পড়ে রইলেন। যে করেই হোক পুত্রসন্তান তার চাই-ই চাই।

অনেক চেষ্টার পর আমার ছোট দাদু চন্দন খাতুন গর্ভবতী হলেন। দাদাজান মানত করলেন সন্তান ছেলে হলে তিনি তাকে মাদ্রাসায় পড়াবেন। আর মেয়ে হলে এ জীবনে আর ছেলের মুখ দেখার আশা করবেন না। সংসার ফেলে বনবাসী হবেন।

সৃষ্টিকর্তা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। জন্ম নিল গিয়াসউদ্দিন চাচা। চাচার জন্মের পর অল্প কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন দাদাজান। এর মাঝেই জন্ম দিয়েছেন আমার বাবাকেও।

দাদার মৃত্যুর পরই সংসারে ভাঙন শুরু হয়। বড় দাদুর সাথে ছোট দাদুর চুলোচুলি। তত দিনে বড় দাদুর তিন কন্যা বড় হয়েছে। তার ক্ষমতা বেশি। তিনি দাদাজানের সম্পত্তির একটা বড় অংশ নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন।

সৎ মা হলেও গিয়াস চাচাকে অনেক ভালোবাসতেন বড় দাদু। মেনে নিতেন তার সব অন্যায় আবদার। বখে গিয়েছিলেন তাই চাচা।

চেহারা সুরত ভালো ছিল। ভালো পুঁথি পড়তেন। অভিনয় করতেন। নাম লিখিয়েছিলেন যাত্রাপালায়। মাদ্রাসার কঠিন শাসনের বেড়াজালে তাকে আটকে রাখা যায়নি। বিভিন্ন এলাকার মেয়েদের সাথে প্রেম করে সময় কাটাতেন।

বদনাম হয়ে গিয়েছিল খুব। বাজে জিনিস খাওয়ার কারণে শরীরটাও গিয়েছিল ভেঙে। বড় দাদু, ছোট দাদু কারো কথাই শুনত না চাচা এ সময়।
চাচার পাল্লায় পড়ে অধঃপতন হয়েছিল বাবারও। যাত্রায় অভিনয় করেছিলেন কিছুদিন। তবে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিলেন।
বাজে জিনিস খেয়ে মাত্র চব্বিশে চাচাটা যখন দুনিয়া ছাড়লেন তখন বাবা আর খারাপ কিছু করার সাহস পায়নি। সিধে হয়ে গিয়েছিলেন একদম। তবে যাত্রাপালায় অভিনয় করার বদনামটা এখনো বইতে হয় তাকে।
চাচার মৃত্যুর পর ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা থেকেই ক্লাব ঘরটা তোলেন বাবা। চাচার মতো যারা গান, অভিনয়, যাত্রা, নাটক ভালোবাসেন তাদের জন্যই ছিল এ ক্লাব। কিন্তু রাজনীতির লোকরা ক্লাবটার দখল নিতে দেরি করেনি একটুও। গান-নাচ বাদ দিয়ে এখন রাজনীতির সাথে জড়িত কাজকর্ম করেন এখানে। তবে ভদ্রতার খাতিরে মাঝে মাঝে বাবার কাছে ক্লাবের ব্যাপারে অনুমতি নেওয়ার জন্য যায় ছেলেপেলেরা। ওসব না গেলেও অবশ্য চলে।
আজকালকার ছেলেরা অনুমতির ধার ধারে না। তারা দিনমান ক্লাবে হিন্দি গান বাজায় আর রাতে খারাপ ছবি দেখে। নাটকফাটক, অভিনয় নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।
'ভাইজান পুজোর চান্দা তো পাইলাম না। পূজা তো আইসা পড়ছে। জিলাপি খাইবেন? ভালো বানায় এই দোকানে।' আস্ত একটা জিলাপি মুখে নিয়ে কোঁৎ করে ঢোক গেলার মতো শব্দ করে কোনো রকমে কথাগুলো বলল কমলেশ। আমিও ভাবনার জগৎ থেকে ফিরলাম বাস্তবে।
ভাইজানের চোখ-মুখ লাল। কপালে জমা হয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে নিশ্চিত। কমলেশের কথার কোনো জবাব না দিয়েই ভাইজান আমাকে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন বাড়ির দিকে।
যাওয়ার পথে দুই ব্যাটারির টর্চটা জ্বালানোরও সাহস হলো না। চাঁদের আলোর ওপর ভরসা করেই বাড়ি ফিরতে লাগলাম।
ফিরেই মাকে বলতে হবে সব ঘটনা। আমি আজকাল আর কোনো কথা লুকোতে পারি না। মাকে ফোনের ঘটনাটা বললেই ভয় পেয়ে যাবেন তিনি।

শুরু করবেন কান্নাকাটি। ভাববেন যাওয়ার জন্য তার আদরের ছেলেটা তোড়জোড় শুরু করেছে অবশেষে।
কী দরকার মাকে কষ্ট দেওয়ার। লুকোতে হবে। লুকোতে হবে সব কথা! কিন্তু প্রতিদিনকার এত সব চমক, রোমাঞ্চকর ঘটনা লুকানোর সাধ্যি আমার নেই। আজ লুকোতেই হলো। বড় চমকের কাছে ঢাকা পড়ে গেল আমার নিজের ঘটনাটা।
বাড়ি ফিরেই দেখলাম হাজির নিশা আপার জামাই জহর ভাই। দু দুটো মস্ত ইলিশ মাছ আর দু প্যাকেট চিঁড়ের মোয়া নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি।
তাকে দেখেই বিধ্বস্ত, ক্লান্ত ও রেগে থাকা ভাইজানটা ঘরে ঢুকে খিল দিলেন। বেরোলেন না আর সারা রাত। কেউ সাহস করে ডাকতেও গেল না তাকে। একবার শুধু ঘরের জানালায় উঁকি দিয়ে আমি দেখলাম, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ভাইজান।
গায়ে, গতরে, বয়সে বড় হলেও ভেতরে ভেতরে সেই ছোট্টটিই রয়ে গেছে সে এখনো। মনে মনে বললাম, 'আহা রে বেচারা। আহা রে...।'
কারো কান্না দেখলে কষ্ট হয়। নিজেরও কান্না পায়। আমি তো কাঁদি না এখন আর। নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিলাম একপর্যায়ে। আরেকটা নির্ঘুম রাত কাটবে এখন। যন্ত্রণায় রাতভর বালিশের তুলো ওড়াব শুধু। এই শামুকের জীবন ভালো লাগে না একদম। খোলস ভেঙে মুখ তুলে একবার আকাশটা দেখতে চাই আমি। একবার।
জানি, ও সাধ আর এ জীবনে পূর্ণ হবে না আমার!

**৬.**

নিশা আপার পরনে লাল পাছাপাড় শাড়ি। গলায় কাঠের পুঁতির মালা। ঠোঁটটা হালকা লাল লিপস্টিক দিয়ে লেপা। কপালে মস্ত রঙিন টিপ। এমন সুন্দরও কেউ হতে পারে!
পুজো শুরুর প্রথম দিন আজ। কমলেশের বাড়ি লোকে লোকারণ্য। আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই ওদের।

সকাল সকাল আমি, ভাইজান, নিশা আপা আর জহর ভাই চলে এসেছি কমলেশদের বাড়ি। কমলেশই নিয়ে এসেছে আমাদের। জোর করে। দুপুরে খেতে হবে এখানে। দেখতে হবে পুজো। নিতে হবে প্রসাদ।
পুজো বলে সাজগোজ করেছে নিশা আপা। জহর ভাইও কম সাজেনি। সদ্য মাড় দেওয়া পাঞ্জাবি তার পরনে। সরিষার তেলে ভেজা পরিপাট চুলগুলো দেখে বোঝা যায় তার চিরুনিটার ওপর দিয়ে বহু ধকল গেছে আজ।
বাড়িতে এসেই নিশা আপা ব্যস্ত হয়ে গেল মেয়েদের সাথে কথা বলতে। জহর ভাইও নিলর্জ্জের মতো গেল তার পিছু পিছু। আমি আর ভাইজান চুপচাপ বসে রইলাম সামনের ঘরটায়। এক ফাঁকে কমলেশের বউ এসে দুটো করে নারকোলের নাড়ু দিয়ে গেল। তারপর আবার যেইকে সেই। কমলেশটার ওপর রাগ হচ্ছিল খুব। ব্যাটা বাড়িতে দাওয়াত করে নিজেই হাওয়া হয়ে গেল।
আজ ষষ্ঠির দিন। বোধনে খুলবে দেবী দুর্গার শান্ত-স্নিগ্ধ-মায়াভরা চোখের পলক। দেবীর সেকি চাহনি। দারুণ লাগে দেখতে।
তবে সবচেয়ে মজা নাড়ু খাওয়ায়। পুজোর সময় বানানো নাড়ুতে যে স্বাদ, সে স্বাদ আর কখনো পাইনা আমি।
হঠ্যাৎ চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে বের হয়ে এলাম বাইরে। দেখি বুড়ো, রোগা একটা হাতির পিঠে বসে আছে কমলেশ। হাতিটা শুঁড় দিয়ে বাড়ি মারছে নিচে দাঁড়ানো মাহুতের পিঠে। মাহুতও হাতিটার মতো বুড়ো আর রোগে-শোকে ভোগা। বাড়ি খেয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে বারবার লোকটা। মজার দৃশ্য। কই থেকে কমলেশ এই জিনিস জোগাড় করেছে কে জানে!
তবে তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা যায়। বাচ্চা, বুড়ো, নারী, পুরুষ–সবাই এসে ভিড় করেছে হাতির চারপাশে। ধূপের ধোঁয়ায় ঢাকঢোল, কাঁসর-মন্দিরার চারপাশ কাঁপানো নিনাদ আর পুরোহিতের জলদভক্তিকণ্ঠে. 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা... মন্ত্রোচ্চারণের ভেতর কমলেশের হাতি নিয়ে এই পাগলামিটা জমেছে বেশ।

'নাম শুয়োরের বাচ্চা। নাম। সারা জীবনটা জ্বালাইলি আমারে। হাতির পিঠ থাইকা নাম।' কমলেশের বাবার চিৎকার আর গালিগালাজে আচমকা পরিবেশটা এলোমেলো হয়ে গেল। দেখলাম কমলেশের বাবার হাতে দা।

ছোট ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছে। হাতি রেখে মাহুতও দিয়েছে দৌড়।

কমলেশের বউ তার শ্বশুরের হাত থেকে দা নেওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না। কমলেশের মা জুড়ে দিয়েছে কান্না আর কমলেশটা হাতির পিঠে বসে উশখুশ করছে। এ মুহূর্তে পিঠ থেকে নেমে দ্রুত পালানোর কোনো উপায় নেই বলেই তার এমন অস্থিরতা।

পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিতে একটু সময় লাগল আমার।

কমলেশের বাবার গালি দেওয়া কথাগুলো থেকে গালিগুলোকে আলাদা করার পর বুঝলাম, কমলেশ তার বাবার ঘরের আলমারি থেকে সাত হাজার টাকা চুরি করেছে। চুরি করা টাকায় বায় না করে নিয়ে এসেছে হাতি। পুজোর দিনে সবাইকে চমকে দেওয়া, আনন্দ দেওয়াটাই ছিল কমলেশের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হলেও চুরির জন্য শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়তে হলো কমলেশকে।

আমি আর ভাইজান অনেক কষ্ট করে কমলেশের বাবার হাত থেকে কেড়ে নিলাম দা-টা। এই বুড়ো বয়সেও তার শরীরে শক্তি অনেক। বাইরে থেকে দেখে শক্তি আঁচ করার উপায় নেই। চিৎকার, চেঁচামেচি, রাগারাগির পর হঠ্যাৎই নিশ্চুপ হয়ে গেল বুড়ো লোকটা। কমলেশ অনেক কষ্টে হাতির পিঠ থেকে নেমে পালাল আর তার বউ তার শাশুড়ির সাথে তাল মিলিয়ে বসে গেল কাঁদতে। কমলেশ সকাল থেকে কিছুই খায়নি। পুজোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পুজোর এমন আনন্দের দিনে তাদের প্রিয় কমলেশ না খেয়ে আছে–এটাই এখন দুই নারীর কান্নার কারণ।

অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই নিশা আপা পুরো ব্যাপারটা সামলে নিল। কমলেশের বউ আর মাকে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। আমাকে আর জহর ভাইকে আদেশ করল কমলেশকে খুঁজে নিয়ে আসতে।

ঘরের ভেতর থেকে গরম গরম লুচি, ভাজি আর মুরগির ঝোলে ডুবানো আলুর ঘ্রাণ আসছে। সকাল থেকে খাইনি কিছু। তাই এমন খাবার ফেলে কমলেশকে খুঁজতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই আমার। কিন্তু নিশা আপার আদেশ শুনতেই হয়। না শুনে পারি না।

ভেবেছিলাম জহর ভাই প্রতিবাদ করবে। কিন্তু তার অবস্থা দেখলাম আমার চেয়েও খারাপ। এতই খারাপ যে কথা বলার সময় আপার চোখের দিকে তাকাতেই তিনি ভয় পান।

একমাত্র ভাইজানই আরাম করার সুযোগ পেল। নিজের পকেট থেকে কমলেশের বাবাকে সাত হাজার টাকা দেবেন বলে ঘোষণা দেওয়ার পর পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত হয়ে এলো। ভাইজান কমলেশের বাবার সাথে গল্প জুড়ে দিল। গল্প করে বুড়ো লোকটাকে ঠিকঠাক রাখাই এখন তার কাজ। আরামের কাজই বটে!

মাথার ওপরে থাকা মস্ত সূর্যটা তাপ বিলাচ্ছে ইচ্ছেমতো। প্রচণ্ড রোদে ঘামতে ঘামতেই বের হলাম কমলেশকে খুঁজতে। জহর ভাই ঘামছে আমার চেয়েও বেশি। কারণও আছে। এমনিতেই তিনি নাদুসনুদুস ধরনের, তার ওপর পরনের পাঞ্জাবিটার কাপড় এতই মোটা যে মনে হচ্ছে উল দিয়ে বানানো।

'সাত হাজার টাকা আমিও দিবার পারতাম বুঝলা। টাকা আমারও কম নাই। কিন্তু যখন তখন টাকার গরম দেখান্ আমার পছন্দের না।' কচুগাছের একটা পাতা ছিঁড়ে রোদ থেকে বাঁচার জন্য সেটা মাথায় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথাগুলো বলল জহর ভাই।

'আপনার টাকা আছে আমি জানি।'

'কেমনে জানো? আমার টাকার খবর তো তোমার জানার কথা না। লোকমুখে যদি কিছু শুইনা থাক, তবে সেটা কমই শুনছ। টাকা আমার পাঁচ শ থাকলে আমি লোকেরে বলি পকেটে আছে পাঁচ টাকা। এটাই আমার স্বভাব।'

'ভালো স্বভাব। খুব ভালো।' খিদে নিয়ে এসব আলাপ করার ইচ্ছে না থাকলেও জহর ভাইয়ের কথায় তাল মেলাতে হচ্ছে। তিনি জামাই মানুষ। তার সাথে ভালো ব্যবহার করে ভালো থাকাটাই নিয়ম।

‘ধন্যবাদ। আমার স্বভাবের ব্যাপারটা ধরতে পারছ তাড়াতাড়ি। মাথায় বুদ্ধি আছে তোমার। বড় ভাইয়ের মতো পাগলা না, সেইটা আমি আগেই বুঝছি।’
‘ভাইজানের ওপর আপনের অনেক রাগ, তাই না জহর ভাই?’ আমি টাকার প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য প্রশ্নটা করলাম। এখন অনেকক্ষণ চুপ থাকবেন জহর ভাই। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তাকে অনেক বেগ পেতে হবে, সন্দেহ নেই তাতে।
উত্তর দিলেন না জহর ভাই। চুপচাপ হাঁটলাম আমরা কিছুক্ষণ। জহর ভাই যেদিকে যাচ্ছে আমিও কোনো রকম উচ্চবাচ্য না করে সেদিকেই হাঁটছি। তিনি এখন ঘামছেন অনেক বেশি। প্রশ্নটা শুনে রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে হয়তো।
‘তুমি অতি বদ পোলা। অতি বদ। তুমারে নিয়া আমার ধারণা ভুল ছিল।’ রাগ নিয়ে কেমন যেন হাঁসফাঁস করতে করতে আমাকে কথাগুলো বললেন তিনি।
‘আমারে মাফ করেন। এমন প্রশ্ন আর করব না। ভুল হইছে। চলেন, জনতার হাটে যাই। সেখানে ভালো লেবুর শরবত পাওয়া যায়। গরমে এই জিনিস খাইলে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হবে।’ আমি হাসতে হাসতে কথাগুলো বললাম। তাকে এ অবস্থায় দেখে কেন জানি হাসি পাচ্ছে।
‘হাসবা না। খবরদার হাসবা না। আর আমার মাথা নিয়া তোমার চিন্তাকরনের কাম নাই। চুপচাপ আমার সাথে হাঁটো। কমলেশরে খুঁজতে হবে। নিশার আদেশ।’ এই কথা বলার পর জহর ভাই ঘামতে লাগলেন আরো বেশি। বিশ্রী অবস্থা। এই গরমে স্ট্রোক করে বসাটা অস্বাভাবিক কিছু না।
ঘামে ভেজা শরীরটা নিয়ে টানতে টানতে একসময় হাজির হলেন জনতার হাটে। ঠিক ঠিক দোকান চিনে লেবুর শরবত খেলেন কয়েক গ্লাস। আমাকে একবার সাধলেনও না। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলাম শুধু। নিশা আপার জামাইকে অসম্মান করা যায় না। তাই চুপ থাকাই ভালো।
‘শরীরটা ঝরঝরা লাগতেছে। খাবা নাকি এক গ্লাস?’
‘না। লেবুর শরবতে আমার অ্যালার্জি আছে। এই জিনিস আমি খাই না।’ শুকনো মুখে বললাম।

‘আরে খাও খাও । পুরুষ মানুষ এত রাগ করলে চলে । প্রশ্নটা শুইনা হঠাৎ মাথাডা আউট হইয়া গেল । আজকাইল অল্পতেই মাথা গরম হয় ।’
‘ খাব না ভাই । খাওয়ার ইচ্ছা নাই ।’
‘ তাইলে আর কি । চলো নামাজটা পইড়া আসি । আসরের নামাজ পড়ছ । নামাজে অ্যালার্জি নাই তো তোমার আবার?’
‘না । নাই ।’ বললাম আমি ।
এ মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্ষুধায় দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে । শুকনো মুখে কোনো রকমে জহর ভাইয়ের কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছি । তার ওপর মেজাজ খারাপ । জহর ভাইকে এখানে ফেলে রেখে কোনো দোকানে গিয়ে খেতে বসব তারও উপায় নেই ।
আমি রওনা দিলাম মসজিদের দিকে । জহর ভাইয়ের কথা মানে নিশা আপার কথা । এই কথায় না বলা যাবে না ।
‘শুনো, আমি সহজ লোক না । মহা চালাক লোক । নিজের এই পরিচয় তুমারে দিতে লজ্জা নাই । তুমি ঘরের লোক । তুমারে বলা যায় । তোমার ভাইজানের ওপর আমার কোনো রাগ নাই । এমুন নির্বিষ, ম্যান্দা মারা পুরুষের ওপর রাগ করার কিছু নাই । তার ওপর আমার যেইডা আছে সেইটা হইলো করুণা । কঠিন করুণা । ’
‘এই কথা শুনতে ভালো লাগতেছে না । চলেন অজুঘরে যাই । অজু করা দরকার ।’
‘কথা তো আমার বলার ইচ্ছা ছিল না । তুমিই তুলছ । যাহোক তুমারে একটা ভালো খবর জানাই । বেশি ভালো খবর । এই খবর এখনো কেউ জানে না । তুমার নিশা আপার সন্তান হবে । সন্তানের পিতা তুমার সামনে দাঁড়ানো এই আমি জহর উদ্দিন সাহেব । খুব শিগগিরই ধুমধামের সহিত এই খবর সবারে জানানো হবে । আমার সন্তানের জন্য দোয়া রাখবা । অনুরোধ ।’ কথাটা বলেই অজুঘরের দিকে রওনা দিলেন জহর ভাই । আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না । অবশ্য আমার তেমন কোনো কথাও নেই ।

দুপুরের রোদ পড়ে গেছে। বিকেল নেমে এলো তাড়াতাড়ি করেই। মাথায় আমার নিশা আপার সন্তান হওয়ার খবরটা চেপে বসেছে।
খুশির খবর। দারুণ খুশির খবর। আমি খুশি হওয়ার চেষ্টা করছি।
মসজিদের ভেতর থেকে খুতবা শোনা যাচ্ছে। মুসল্লিদের সাথে কথা হচ্ছে আবাবিল পাখি নিয়ে। হুজুরের অবর্তমানে মুয়াজ্জিন নামাজ পড়াবে আজ। এই মুয়াজ্জিনের মতো সুন্দর কণ্ঠ আমি আর কোনো দিন শুনিনি। তিনি যখন আজান দেন তখন বুকের একদম ভেতরে ঘা লাগে।
নামাজটা পড়া দরকার। ভেতরটা অস্থির হয়ে আছে। নামাজ পড়লে শান্ত হবে। আমি অজু করে নামাজের কাতারে দাঁড়ালাম। কিন্তু নামাজে মন বসল না। মন পড়ে আছে নিশা আপার কাছে। বাকি সব ভুলে গেছি।
ভুলে গেছি প্রিয় বন্ধু কমলেশের কথা। ভুলে গেছি আস্ত পৃথিবীর আর বাকি সব কিছু। আমি পাপী। ঘোর পাপী। আমার বিচার হওয়া দরকার। আখিরাতে না। বিচারের দরকার এই পৃথিবীতেই।

৭

'কি বলিব মেঝ দিদি আমার মৈশাল বন্ধু এলো না,
মৈশাল বিহনে আমরার প্রাণ বাঁচে না।
মৈশাল, মৈশাল বলো তোমরা, মৈশাল কেমন জানো না,
বামহেলে বাতাসে দোলে মৈশাল কাঁচা সোনা,
মৈশাল বন্ধু লাঙল চষে পলইডাঙ্গার মাঠে,
এমন ইচ্ছা করলো দিদি জল লয়ে যায় ঘাটে...।'

আসমানটা চিড়ে ফালা ফালা করেছে আজ কেউ। বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে সারিগান। তারক বাবুর বিখ্যাত সারিগানের দল এসেছে। রং মেখে সং সেজে নৌকাবাইচে গান গাইছে তারা। আমি গানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছি। মন্দ না।

হাজারো মানুষ জড়ো হয়েছে আজ কুমারখালী নদীর তীরে। বৃষ্টিতে ভিজে শুনছে সারিগান। কেউ কেউ তাল মেলাচ্ছে গানে। কেউবা শুরু করেছে এলোমেলো পায়ের নাচ।

কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে আকাশ। একটু পর পর বাজ পড়ে। তখন আলোকিত হয় চারপাশ। চারপাশটা দেখলে এ সময় রূপকথার মতো মনে হয়।

বাবা, মা, নিশা আপা, জহর ভাই, ভাইজান, কমলেশের পুরো পরিবার হাজির এখানে। নির্বাচনের আগে তোবারক ভাই ভালো ফন্দি এঁটেছেন। প্রচারণা বাদ দিয়ে আয়োজন করেছেন নৌকাবাইচের। পুরো গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছে বাইচ দেখার জন্য।

বাইচ শুরু হওয়ার আগে তোবারক মিয়া আধ ঘণ্টার জন্য জনতার উদ্দেশে কিছু বলেছেন। চেয়েছেন ভোট। লোকজনের মধ্যে ভালো সাড়া পড়েছে। তোবারক মিয়া এবার মেম্বার হয়ে যাবেন বলেই মনে হচ্ছে।

‘ তোবারক ভাই জিনিস একটা। কি কস?’ বেগুনি চিবুতে চিবুতে এসে বলল কমলেশ। শালা সারাক্ষণই খায়। মুখে কিছু না কিছু একটা দেওয়া থাকবেই তার।

কমলেশের ওপর রেগে আছি। পুজোর দিন বহু হুজ্জোত হয়েছে এই ব্যাটার জন্য। কথা বলব না। তবে জানি কথা না বলে লাভ হবে না। আমি যে রেগে আছি এটা বোঝার সাধ্য তার নেই।

কথার কোনো জবাব না দিয়েই কমলেশের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ালাম। মায়ের মন ভালো এ মুহূর্তে। রান্নাবান্না করেই কাটছে এই মহিলার পুরো জীবন। তার সব সুখ-দুঃখ গোপন কথা রান্নার ঘরটার সাথেই। কোন তরকারিতে কী দিলে স্বাদ একটু বাড়বে বা কমবে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতেই চলে যায় তার দিনের বেশির ভাগ সময়। ঘরের বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পান না তেমন একটা। আজ সুযোগ পেয়ে মা-টা তাই আছেন আনন্দে।

‘বেগুনি খাইবি? কমলেশের বউ বানাইছে?’ পান খাওয়া ঠোঁট নিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন মা।

‘না । ভাজাভুজি খাওয়া বন্ধ করছি ।’ বললাম আমি ।
‘ভালো আয়োজন । ম্যালা মানুষ ।’
‘হুম ।’ ছোট্ট করে উত্তর দিলাম ।
একটু থেমে মা আবার বললেন,‘ জামাই তোরে কিছু কইছে?’
‘কই । না তো । ক্যান?’ প্রশ্নটা শুনে ধাক্কা লাগল বুকে । মা কি তবে নিশা আপার সন্তান হওয়ার ব্যাপারটা জেনে গেছেন । এত তাড়াতাড়ি করে জহর ভাইয়ের তো কিছু জানানোর কথা না ।
‘তোর ভাইজানরে একটু চোখে চোখে রাখিস ।’
‘এত দিন পর চোখে চোখে রাখার আবার কী হইল । কিছুই তো বুঝতাছি না কথা ।’
‘অত বুঝনের কাম নাই । বেশি বুঝদার হইলে ঝামেলা । তোর বাপের সাথে এই নিয়া আমার কথা হইছে । কাইল সূর্য উঠনের আগে নিশা গ্রাম ছাড়ব । তোরে যেইডা করতে কইলাম তুই হেইডা করিস ভালামতন ।’ কথাটা বলে সারিগানের সাথে তাল মেলাতে লাগলেন মা । ‘ সীতা গেলে, সীতা পাবো প্রতি ঘরে ঘরে... ।’ বলে হেঁড়ে গলায় হাঁক দিলেন জোরে । একটু পরই তার সাথে এসে যোগ দিল নিশা আপা । দুজনে মিলে গাইতে লাগল গান ।
নিশা আপাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে মা তাকে গ্রাম ছাড়তে বলেছে । বোঝার কথাও না । তিনি এমনই । আপাকে বোঝা সহজ কাজ নয় ।
কিন্তু মা আজ অবাক করে দিল আমাকে । সংসারের সব লোক এমন অচেনা হয়ে গেলে বিপদ । ঘরের কোনো কথাই এখন আর আমাকে জানানো হয় না । ভেতরে ভেতরে কতই না শলাপরামর্শ হয় ! আমি সব জায়গায় অনুপস্থিত । ছোট ছেলে বলেই হয়তো আমাকে দূরে রাখা হয় সব কিছু থেকে । নিজ ঘরের ভেতরেই নিজের অস্তিত্ব ঠাওর করাটা বড্ড মুশকিল হয়ে পড়ছে আজকাল ।
ভিড়ের মাঝে ঝামেলা শুরু হয় হঠাৎ । চিৎকার শুনে আমি আর কমলেশ দৌড়াই সেদিকে ।
কিছু মানুষের আহাজারি আর কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে ওঠে অল্পতেই । এসবের সাথে তাল মেলাতেই যেন বেড়ে যায় বাজ পড়ার পরিমাণ ।

ছয়-সাত বছর বয়সী কোনো এক বাচ্চা হারিয়েছে ভিড়ের ভেতর।
মায়ের হাত ধরে এসেছিল বাইচ দেখতে। ভিড়ের মাঝে সন্তান কখন হাতছাড়া হয়েছে খেয়ালই করেনি মা। এখন শুরু করেছে পাগল বিলাপ। কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা।
নিখোঁজ সংবাদ জানিয়ে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে একটু পর পর। আনন্দের মাঝে সামান্য ছন্দপতন।
কমলেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শোকে কাতর মাকে নিয়ে। জহর ভাইও এসে হাত লাগিয়েছে সাথে। আমি সাহায্য করার মতো কিছু না পেয়ে বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।
'আমার সাথে আয়। তোর সাথে কথা আছে। জরুরি।' প্রায় জোর করে হাত ধরে টেনে ভিড়ের মাঝখান থেকে আমাকে বের করে আনল ভাইজান। ভিজে একসা হয়ে আছে সে। এত সব ঝামেলার ভেতরেও তার ভেজা এলোমেলো চুল আর রক্তলাল চোখ নজর এড়াল না আমার।
'নিশা চইলা যাবে জানিস তুই? ' মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্নটা করল ভাইজান। অবস্থা ভালো না তার। ভয় লাগছে দেখে লোকটাকে।
'ভাইজান, চলেন কোথাও গিয়া বইসা কথা বলি। এমুন ভিজলে ঠাণ্ডা লাগবে। নিউমুনিয়া টিউমুনিয়া বাঁধাইয়া বসবেন।'
'তুই আমার প্রশ্নের জবাব দে। নিশা কি চইলা যাবে?'
'হুম যাবে। তেমুনই তো শুনলাম মায়ের কাছে।'
'মায়ের দোষ নাই। বাবার দোষ। বাবার। তিনিই তাড়াইতেছেন নিশারে।'
'ভাইজান বাজারে গিয়া চা খাই চলেন। আর নিশা আপারে নিয়া এত উতলা হওনের কিছু নাই। সে তো আর সারা জীবন এইখানে পইড়া থাকবে না। সংসার আছে তার।'
'নিশার বাচ্চা হবে। আমি খুশি হইতে পারতাছি না। ক্যান যে পারি না খুশি হইতে...।' কথা বলতে বলতে কাদামাটিতেই বসে পড়ে ভাইজান। কাঁদতে থাকে। আমার কী করা উচিত বুঝে পাই না। আমিও কাঁদার ওপর পা ছড়িয়ে বসে ভাইজানের পিঠে হাত বোলাতে থাকি।

‘জহর ভাইয়ের কথা কানে নিয়েন না ভাইজান। সে লোক খারাপ।’
‘জহর না। আমারে নিশা জানাইছে তার বাচ্চা হবে এই কথা।’ কান্নার কারণে ভাইজানের কথাগুলো ভেঙে ভেঙে যায়।
নিশা আপার কথা শুনে আমার আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। কাজটা ঠিক করল না সে। জানি, ভাইজানের পাপের ক্ষমা নাই। তার পরও কেন যেন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হলো না। ভাই বলেই হয়তো ভাইয়ের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।
‘তোরা হয়তো সবাই আমারে দোষ দিবি। কিন্তু দোষ আমার নারে ভাই। দোষ আমার না।’
‘আপারে নিয়া যহন তোমার উতলা হবার দরকার আছিল তুমি হও নাই। এখন এইসব ভাইবা লাভ কি ভাইজান।’
‘তোরা ভুল জানস আমারে। ভুল জানস।’ ভাইজান কাঁদছে এখনো। পুরুষ মানুষকে বেশিক্ষণ কাঁদতে দেখলে বিরক্ত লাগে। ভাইজানের শরীর কাদায় মাখামাখি। বড্ড অসহায় লাগছে এ মুহূর্তে তাকে দেখে। মায়া মায়া লাগছে। আমি ভাইজানকে জোর করে দাঁড় করালাম। তারপর টানতে টানতে বাজারের দিকে যাওয়া শুরু করলাম।
চাই না ভাইজানকে ঘিরে ভিড় জমুক। চাই না এই গ্রামে আর কোনো নাটক হোক আমার পরিবারকে নিয়ে।
আমি নিশ্চিত ভিড়ের ভেতর থেকে পুরো ব্যাপারটি দেখেছেন নিশা আপা। দেখেছেন ভাইজানের কান্না। শান্তি পেয়েছেন প্রতিশোধের কথা ভেবে। কিন্তু এটাও জানি, ভাইজানের কান্না দেখে তিনি খুশি হতে পারেননি। খুশি হওয়া সম্ভবই না।
বৃষ্টির তেজ কমতে থাকে। আমি কাদাভর্তি পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকি ভাইজানকে নিয়ে। নিজেকে খুব বড় বড় মনে হয়। সেই ছোট্ট আমিটা ধাই ধাই করে অল্প সময়ের ভেতর কখন যে বড় হয়ে গেছি টেরই পাইনি।
মাইকে সারিগান শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ। সব পেছনে ফেলে বাজারের দিকে যাচ্ছি দুই ভাই।

খুব করে চাচ্ছি এখন বৃষ্টিটা পালাক। বিকেলের শেষ ভাগে বৃষ্টিভেজা আকাশ দেখতে ভালো লাগে। মনে হয় ময়লা আকাশটাকে বৃষ্টি দিয়ে ধুয়েমুছে কেউ যেন লেপে দিয়ে গেল।

নীল, খাঁটি, পরিস্কার, ফকফকা নীল আকাশ। সে আকাশের বুকে একটু পর পর ছড়ানো থাকে ধুলোর মতো মেঘের গুঁড়া। কপাল ভালো থাকলে আঁধার নামার আগেই তাড়াহুড়ো করে চলে আসে চাঁদটা। কি সুন্দর মন খারাপ করা সে চাঁদের সামান্য আলোর তেজ! একপর্যায়ে আঁধার নামলেই তারাগুলো উঠি উঠি করে। ভিড় করে চাঁদের চারপাশে। জ্বলে আর নেভে। আকাশের বুকে তাদের ঠাঁই নিতে দেখে ভালো লাগে বড়ো। এত দূরের তারা তার পরও মনে হয় কত চেনা। মনে হয় আপন।

কাল নিশা আপা চলে যাওয়ার পর কী হবে জানা নেই আমার। এসব নিয়ে ভাবতে চাই না আর। সংসারের কাছের মানুষ এখন অচেনা মানুষ। আমি শুধু দূরের জিনিস নিয়েই ভাবতে চাই। ভাবতে চাই যারা আমার চেনা তাদের নিয়ে।

বৃষ্টি পালাক, চাঁদ উঠুক, তারারা ঠাঁই নিক আকাশে। আমি তাদের নিয়েই থাকব এখন। তাদের দেখেও মন খারাপ হলেও আপত্তি নেই আর। কারণ এই মন খারাপের ভেতরেও এক ধরনের ভালো লাগা আছে। দারুণ মন খারাপ করা ভালো লাগা।

**৮.**

টিনের চালে অনেক ফুটো। সে ফুটো দিয়ে হুড়মুড়িয়ে শীত ঢোকে।

কাদের ভাইয়ের দোকানটা একদম নদীর পাড় ঘেঁষে বসানো। নদীর দিক লাগোয়া জানালাগুলো খোলা থাকলে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়ে দোকানে। বাতাস ঢোকে ফুটো টিনের চাল দিয়েও। শীত কাবু করে ফেলে খদ্দেরদের তখন। আজ শীত পড়েছে। শীতের সাথে একটু একটু কুয়াশা। আবহাওয়ার মাথা বিগড়ে গেছে। কখন কী হবে ঠিক নেই।

দূরে নদীর ওপর কুয়াশা দেখা যায়। নিজ নিজ জায়গা থেকে একটু পর পর পিছলে সরে যায় তারা। অনেক চেষ্টা-তদবিরের পর যেন সে সময় কুয়াশার শরীর চিড়ে সূর্যের মৃদু আলো ঢোকে।

রুটি আর আলুভাজি দিয়ে নাশতাটা সারলাম আমি আর কমলেশ। সবশেষে ছোট ছোট গরম রসগোল্লা।

বড্ড ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে সকালগুলো, দুপুরগুলো, রাতগুলো খুব সুন্দর লাগে। পৃথিবীর সব কিছুই ভালো লাগে তখন। সব কিছুরই প্রেমে পড়ে যাই। ইচ্ছে হয় তখন নিজে উপার্জন করে সেই টাকায় মাকে একটা শাড়ি কিনে দিই আর বাবাকে একটা জায়নামাজ। খুব ইচ্ছে হয় নিশা আপাকে গিয়ে বলি, 'অনেক তো হইল, অনেক তো দেখলা, এবার আমারে ভালোবাসতে দ্যাও। দ্যাখো কেমন তাক লাগাইয়া দিই।'

কিন্তু এমন ভালো লাগার সময় আসে কদাচিৎ। আফসোস।

ভাইজান চা খাচ্ছে। মালাই চা। কাদের ভাইয়ের দোকানের স্পেশাল চা। ভাইজানের চা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকি আমরা দুজন।

'সকাল সকাল টেম্পো করে চলে যাব। কী কস'–হালকা একটা ঢেকুর তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলে কমলেশ।

'হুম। টেম্পোই ভালো।'

'নৌকায় গেলে দেরি হইবে। দিন থাকতে থাকতে আসতে হবে তো। কী কস? '

' হুম '

কমলেশের সাথে কথা বলে সকাল বেলার ভালো লাগাটা নষ্ট করতে চাচ্ছিলাম না। হুম, হুম করছিলাম তাই। ওর সাথে 'হুম' আর 'হু' বলেই সহজে চালিয়ে নেওয়া যায় কথা।

বেলা বাড়ছে। উঠি উঠি করা সূর্যটার ঘুম পুরোপুরি ভেঙেছে এতক্ষণে। সূর্যের রোদ ফালা ফালা করে ছুরির মতো কাটছে কুয়াশা।

রোদ, কুয়াশা সব কিছু ভুলে, উপেক্ষা করে আমি হাঁটতে লাগলাম বড় রাস্তার দিকে। টেম্পো ভাড়া করতে হবে। যেতে হবে নুরাইনপুর।

নুরাইনপুর গিয়ে আবার নৌকায় করে পার হতে হবে ধুলিয়া নদী। এ নদী আকারে অনেক বড়। জোয়ার কিংবা ভাটা সব সময়ই থাকে প্রচণ্ড স্রোত। ঢাকা থেকে রাতে রওনা করা লঞ্চগুলো এ সময় এসে পৌঁছায় ধুলিয়া ঘাটে। মানুষের ভিড়ে মুখর হয়ে থাকে পুরো এলাকা।

এই লঞ্চঘাটের পাশেই আমাদের বিঘেখানেক জমি আছে। সে জমি নিয়ে গোলমাল চলছে খুব। দলিল আর সরকারকে খাজনা দেওয়া নিয়েই যত ঝামেলা। বাবা তার দুই ছেলেকে যেতে বলেছেন জমির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।

টেম্পো পেতে দেরি হলো না। আধ ঘণ্টার ভেতর পৌঁছে গেলাম নুরাইনপুর। পুরোটা পথ চুপ রইলেন ভাইজান।

ভেবেছিলাম নিশা আপাকে নিয়ে কথা হবে। হলো না। নুরাইনপুর এসেই আবার খিদে পেল কমলেশের। কিন্তু ভাইজানের মন ভার দেখে খেতে গেল না। ভাইজান কমলেশের ব্যাপারটা বুঝল। নিজেই জোর করে আমাদের নিয়ে বসল একটা দোকানে। মিষ্টি শিঙাড়া আর বালুশা খেতে খেতে শুরু করল কথা।

'কাকিমার চোখের ছানিটা কাটাইয়া ফ্যাল কমলেশ। চোখে তো কিছুই দ্যাখে না। দেরি করিস না আর।'

'টাহা নাই। আর মায় শহরে যাইতে রাজি না।'

'রাজি তো হইতে হবে। রাজি করাবি। টাকা আমি দেব। আচ্ছা, এদিকে ফোন-ফ্যাক্সের দোকান আছে রে? বিদেশে ফোন করা দরকার।'

বিদেশের কথা শুনে মুখ শুকনো হয়ে গেল আমার।

নিশা আপার পর ভাইজানও কি চলে যাবে এবার !

'ভাইজান অই পাড়ে বড় বাজার। নদী পার হইলেই দোকান পাইবেন। এই বারের এমপি বহুত উন্নয়ন ঘটাইছে।'

'হুম। বোঝা যায়। চল, নৌকায় উঠি। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব। শরীরটা ভালো ঠেকছে না।'

কমলেশ আর ভাইজান নৌকায় উঠে যায় তাড়াতাড়ি করে। নদী শান্ত আজ। লঞ্চের আনাগোনাও কম।
অনেকক্ষণ পর পর পোঁওওওওও পোঁওওওওওও শব্দে হর্ন বাজিয়ে মুলাদীর দিকে চলে যায় লঞ্চ। নৌকার পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় ঢেউ হয় খুব। নৌকা দুলতে থাকে। ভাইজান জড়সড় হয়ে বসে থাকে নৌকার পাটাতনের ওপর। তিনি সাঁতার জানেন না। জলকে ভয় পান খুব।
মনে পড়ে যায় একবার পুরো পরিবার মিলে আমরা এই নদী পার হয়েছিলাম। সেবারও নৌকায় উঠে এমন ভয়ে ভয়ে ছিল ভাইজানটা।
তার তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা। কেন্দ্র পড়েছে নুরাইনপুরে। একটাই মাত্র কেন্দ্র। দূর-দূরান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা এসেছে এখানে। কেন্দ্রের চারপাশের দোকানপাটগুলোতে দেদার বিক্রি হচ্ছে জিনিসপত্র। মেলা বসেছে যেন। আমি, নিশা আপা, বাবা, মা–সবাই এসেছি ভাইজানকে পৌঁছে দিতে। পরীক্ষার পুরো একটা মাস ভাইজান থাকবেন এয়াকুব মামার বাড়িতে। মায়ের দূর-সম্পর্কের ভাই এই এয়াকুব মামা।
গতবারই ম্যাট্রিক দেওয়ার কথা ছিল ভাইজানের। কিন্তু দুটো পরীক্ষা দেওয়ার পরই হয় চিকেন পক্স।
বিশেষ ব্যবস্থায় স্ট্রেচারে করে পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও ভাইজানের শরীরের অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া হয়নি আর।
সবার মন খারাপ ছিল সেবার। মা কেঁদেছিল, আমি, কমলেশ কেঁদেছিলাম আর নিশা আপাকেও চোখ মুছতে মুছতে বলতে শুনেছি, 'না, ঠিক হয় নাই। একদম ঠিক হয় নাই গাধাডার এই সুময় পক্স হওয়া। তাও আবার মুরগি পক্স। ছ্যা...! '

পরেরবার সতর্ক ছিল সবাই। বরগুনার এক পীরের কাছ থেকে ভাইজানের জন্য পানি আর কলম পড়া আনা হয়েছিল।
প্রথম কয়েক দিন ভালোমতো পরীক্ষা দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ঠিকই জ্বরে পড়েছিল ভাইজান। সবার সেকি উৎকণ্ঠা তখন ! বাবা সকালে ডাক্তারের কাছে যান তো বিকেলে যান পীর বাবা, হুজুরের কাছে। কোনো কিছুতেই যখন জ্বর

কমছিল না তখন এলাকার মুয়াজ্জিন বললেন, জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করেননি এমন কোনো ব্যক্তির হাতের ছোঁয়া লাগবে ভাইজানের। শুধু সে যদি পানিপড়া দেয়, তবে মিলবে জ্বর থেকে মুক্তি।
এক দিনও নামাজ কাজা হয়নি–এমন মানুষ আছে কি কোথাও!
সবাই যখন আশা ছেড়ে দিয়েছিল তখন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন এয়াকুব মামা। পানিপড়া দেন, মায়ের পাশে থেকে রাত জেগে সেবা করেন ভাইজানের।
একবারও নামাজ কাজা না করা এ মানুষটির জন্যই সেবার সেরে ওঠেন ভাইজান। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্টার আর পাঁচ বিষয়ে লেটার মার্ক পেয়ে শোরগোল ফেলে দেন এলাকায়।
সে বড় সুখের সময় ছিল। টানা কয়েক দিন বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিলিয়েছিলাম আমি, কমলেশ, ভাইজান আর নিশা আপা।
পুরনো কথাগুলো মনে না করাই ভালো। কী দরকার অযথা কষ্ট পাওয়া। কষ্টের রেশ মুছতে মুছতে পৌঁছে যাই গন্তব্যে।
অল্পবয়সী মাঝির গায়ে জোর আছে। অল্প সময়ের ভেতরই পার করেছে নদী। মাঝিকে দশ টাকা বখশিশ দিয়ে নেমে পড়েন ভাইজান। আর এত টাকা বখশিশ দেওয়ায় পাশে দাঁড়িয়ে রাগে গজগজ করতে থাকে কমলেশ।
এখন এ মুহূর্তে যেতে হবে এয়াকুব মামার বাড়ি। ধুলিয়া নদীর এপারটার বাজার অনেক বড়। চাহিদার প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে।
বাজারে ঢুকতেই দেখা এয়াকুব মামার সাথে। তার থাকার কথা ছিল। অনেক দিন পর দেখা লোকটার সাথে। শরীরটরীর ভেঙে বুড়ো হয়ে গেছে একদম।
'একদম ঠিক সুময় আইছো বাজানরা। দুপুরের খানা তৈরি আছে। খানা শেষে কাজের কথা হবে।' আমাদের দিকে দৌড়ে ছুটে এসে যক্ষ্মা রোগীর মতো কাশতে কাশতে কথাগুলো বললেন মামা।
'সবুর করতে হবে মামা। বাজারে কাজ আছে। কাজ শেষে খানাখাদ্যির কথা ভাবা যাব।' খুব আস্তে করে কথাটা বলেন ভাইজান। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

‘আমি তো সকাল সকাল মুগের ডাইলের খিচুড়ি আর কোয়েল পাখির মাংস পাকায় রাখছি। দেরি হইলে তো সর্বনাশ বাজানরা। ঠাণ্ডা খানায় মজা নাই।’
‘খানা শ্যাষে বাজারে আইলে হয় না ভাইজান? ’ আকুতি জানানোর মতো করে বলল কমলেশ। তার চোখে লোভ। কোয়েল পাখির মাংস খাওয়ার লোভ। এই জিনিস তার অতি প্রিয়।
‘না, হয় না। তোরা না হয় যা। আমি বাজারে কাজ সাইরা আসতেছি।’ বলল ভাইজান।
ভাইজানকে ছেড়ে যেতে মন সায় দেয় না। তার পাখির মতো মন। কই না কই পাখির মতো  উড়াল দিয়া নিখোঁজ হয় আবার !
তা ছাড়া লোকটারে অসুস্থ মনে হচ্ছে। এখন ভাইজানকে একা ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।
‘না, ঠিক আছে। খাওয়া পরে। আগে কাজ। বাজারের দিকে চল কমলেশ।’ জোর দিয়ে কথাগুলো বললাম।
আমার এমন কণ্ঠ শুনে কমলেশ আর কথা বাড়াল না। ভাইজান বাজারে গিয়েই ঢুকলেন ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে। অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা বললেন। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে।
এয়াকুব চাচা কই থেকে যেন ডাব নিয়ে এলেন দুটো। কমলেশ চুকচুক করে একটা ডাব খেতে লাগল। ভাইজান বের হতেই বুঝলাম ঝামেলা হয়েছে কোনো একটা। বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে তাকে।
আমাদের সাথে কোনো কথা না বলেই তিনি গেলেন পাশের একটা ওষুধের দোকানে। তার কাছে শুনেছি, ঢাকা থেকে কিছু ওষুধ আসবে। মাঝির ছেলে আইয়ুবকে দিয়ে দোকানের লোকদের আগেই বলে রেখেছিলেন।
ওষুধ নিয়ে ফিরতেই হঠাৎ কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন ভাইজান। একটু কাছেই ছিলেন এয়াকুব মামা। তিনি দৌড়ে এসে মাটি থেকে তুলে কোলে নিলেন ভাইজানকে। ‘ভাইজানগো... ।’ বলে কঠিন এক চিৎকার দিয়ে ছুটে এলো কমলেশ। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

এলো আশপাশের লোকজন। কেউ তালপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল, কেউ পানি ছিটিয়ে দিল ভাইজানের গায়।
আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। মাথা কাজ করছে না। কোথাও একটা ঘাপলা আছে।
পুরো ব্যাপারটা খোলাসা হওয়া দরকার। ভাইজানের মুঠোয় আটকা ওষুধের ব্যাগটা থেকে চোখ সরাতে পারি না আমি। ব্যাগভর্তি ওষুধ। মানে কী এর? মানে কী?

**৯.**

'আমার সাথে থাকবি এক রাত, এক বিছানায়?'
কি যেন একটা পাখি ডাকছে বাইরে। মাঝদুপুর। গুমোট গরম।
এমনিতেই ঘামছিলাম। নিশা আপার কথা শুনে অবস্থা আরো খারাপ হলো।
এই ঘরে আমি আর নিশা আপা ছাড়া কেউ নেই। বাইরে মানুষের হৈচৈ শোনা যায়। বাড়িতে উৎসব আজ। পুরো গাঁয়ের মানুষ খাবে এ বাড়িতে। বাচ্চা হওয়ার আগে করা আদিখ্যেতা!
জহর ভাইয়ের টাকা আছে। নিজের অনাগত সন্তানের জন্য হাত তুলে খরচ করছেন তিনি। কয়েক গাঁয়ের মানুষ দাওয়াত করেছেন। তাদের জন্য খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়া শেষে পড়ানো হবে মিলাদ।
আমি এসেছি জহর ভাইকে সাহায্য করার জন্য। নিশা আপার আত্মীয় বলতে আমরাই তাই সকাল সকাল আসতে হয়েছে বাড়িতে।
জহর ভাই ব্যস্ত খুব। তিনিই কাজ করছেন সব। কাজের লোক, কামলাদের গালিগালাজ করে মাথায় তুলছেন বাড়ি।
আমি নিশা আপার ঘরে বসে আছি। এ ঘরে আপার অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না। জহর ভাইকে ঢুকতে হলেও দরজায় কড়া নাড়তে হয়।
'সন্দেশটা খা।'

‘খিদা নাই ।’ সামনে থাকা ছোট্ট একটা বাটিতে দেওয়া সন্দেশটার দিকে তাকিয়ে মুখ গোমড়া করে কথাটা বললাম । আপা বলার পর একটু আগে কাজের একটা মেয়ে এসে দিয়ে গেছে এই সন্দেশ ।
‘আমি তুইলা দিমু মুখে? আদর-সোহাগ করি নাই কহনও তোরে ।’
‘কী কন এইগুলা আপা । দূর ।’
‘দূর আবার কি? পছন্দ হয় না আমারে? বুড়ি তো হই নাই এখনো । দ্যাখ্, ভালো কইরা দ্যাখ্ শরীল আঁটসাঁট আছে আমার ।’
‘কী শুরু করলেন আপা কনতো । ভালো লাগতেছে না । মাথা বিগড়াইছে আপনার । বাচ্চা হওনের আগে এমুন হয় ।’ কথাটা বলে ঘর থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম । নিশা আপা ছুটে এসে ধরলেন আমার হাত । তারপর জোর করে হাত ধরে নিয়ে বসালেন তার বিছানায় ।
‘রাগ করিস না ভাই । রাগ করিস না । মাথাটা আসলেই ঠিক নাই । ভাইজান কেমুন আছে তোর? ’ কথাগুলো বলার সময় আপার চোখে উৎকণ্ঠা দেখতে পেলাম আমি ।
‘আছে ভালো । শরীর দুর্বল । ওষুধ চলতেছে । অনেক জোর কইরাও ডাক্তারের কাছে নিতে পারি নাই ।’
‘আমারে কইলি না ক্যান? আমি জোর কইরলে যাইত ।’
‘সেইটা কি উচিত হইত । আপনাগো মাঝে আগের সেই সম্পর্ক না টাইনা আনাই তো ভালো, নাকি?’
আমার এই কথা শুনে কষ্ট পেয়ে আর কথা বললেন না নিশা আপা । ইশারায় আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বললেন ।
বের হওয়ার সময় দেখলাম তিনি তার পাখি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । আপার ঘরে পাখির খাঁচা । পাখি পছন্দ করেন ছোটবেলা থেকেই । পাখিদের মুখে খাবার না দিয়ে তিনি কখনোই কিছু খেতেন না । এখন মনে হয় ভালোবাসাটা আর পাগলামির পর্যায় নেই । বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভালোবাসা ফিকে হয়ে যায় ।
বাইরে বের হতেই দেখা জহর ভাইয়ের সাথে ।

আমাকে দেখেই বললেন,‘ কি মিয়া, হাত লাগাও না ক্যান? বইনের সন্তান নিয়া আয়োজন। মামার তো কাম করতে হইব।’
তার কথার পিঠে হাসলাম শুধু। বাড়ির উঠোনে বাঁশ দিয়ে শামিয়ানা টানানো হয়েছে। কোদাল, শাবল নিয়ে কাজ করছে মজদুররা। উদোম গায়ে কমলেশও কাজ করছে তাদের সাথে। তার শরীর ভর্তি ঘাম।
‘এমুন তাড়াহুড়ায় কাম করন যায়। দূর।’
‘হুম।’
‘হুম, হাম করবি না। মাথা কিন্তু গরম আছে। তাউলায় রক্ত উঠাইস না। কাম কর আইসা।’ রেগে গিয়ে বলল কমলেশ।
‘আমারে দিয়া এইসব হয় না। অন্য কাজ থাকলে বল।’ গোমড়া মুখে বললাম আমি। এই গরমে এসব কাজে যাওয়াই যাবে না।
‘আরেকটা কাজ আছে। করবি?’
‘কী কাজ? ’
‘অন্দরে সব মহিলা সব একসাথে বইসা গান গাইতাছে আর মেহেন্দি লাগাইতাছে। যা গিয়া মাইয়াগো হাতে মেহেন্দি লাগানের কাজ কর। আর নিজেও একটু দিস হাতে।’
আমি আর দাঁড়ালাম না। দ্রুত স্থান ত্যাগ করলাম। রেগে গেলে কমলেশ খুব আজেবাজে কথা বলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা শোনায় ফায়দা নাই কোনো।
লোকজন আসছে-যাচ্ছে। দুনিয়ার ফকির-মিসকিন জড়ো হয়েছে বাড়িতে। এলাকার চেয়ারম্যান ভ্যানভর্তি মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। জহর ভাই এলাকার লোকজনদের ভালোই হাত করেছে বোঝা যায়।
মা এলেন দুপুর যখন পড়তির দিকে। প্রথম ব্যাচের লোকজনের খাওয়া শেষ। বাবা, ভাইজান কেউ আসেননি। আইয়ুব এসে দিয়ে গেছে মাকে।
মা এসে কিছুই খেলেন না। জহর ভাই অনেক সাধাসাধির পর শুধু একটা পান দিলেন মুখে। তারপর চুপ করে ঘরের এক কোনায় বসে রইলেন।
আমি গেলাম মায়ের কাছে। পাশে বসলাম তার।

'ভাইজান আইল না?'
'না। সে এহানে ক্যান আইবো? আহনের মতন কী অইলো?' আমার কথায় খেঁকিয়ে উঠলেন মা। রেগে গিয়ে বললেন কথাগুলো–
'এত রাগলে হয়? নিশা আপা আপনার মাইয়ার মতন। বাবা আসলেও তো পারত।'
'তোর এত দরদ ক্যান? সে আসবো না আসবো এইটা তার ব্যাপার। সামনে দিয়া যা তো। কথা কইতে ইচ্ছা করে না।'
'আপার জীবনে একটা আনন্দের দিন আজ। আইজকে আমি কাউরে ঝামেলা করতে দিমু না।'
'তুই আমার শত্রু।'
'হ শত্রুই। খাবার দিতে বলতেছি। খাইয়া নেন।'
'খামু না আমি।'
'আচ্ছা লাগবে না খাওয়া।' কথাটা বলে বিরক্ত হয়ে চলে গেলাম আমি। লোকজন চলে এসেছে। কমলেশ ব্যস্ত তদারকিতে। ডালে লবণ বেশি হয়েছে বলে রীতিমতো তেড়ে গেল সে বাবুর্চির দিকে। জহর ভাই এসে ঝামেলা মিটালেন। আইয়ুব কলাপাতা পেতে খেতে বসেছে। আমিও চুপচাপ বসলাম তার পাশে। পাতে শিরনি নিয়ে খেলাম। ভালো হয়েছে। কে যেন ভিড়ের ভেতর জামায় হাত মুছে গেল। গায়ে লেগে থাকা গরুর মাংসের ঝোল দেখে বুঝলাম ব্যাপারটা।
এ গাঁয়ের সবাই সম্পর্কে তালই, মাওই আর বেহাই, বেহাইন। তাদের সবারই গায়ে পড়া ভাব। দেখা হলেই নানা প্রশ্ন করছে।
ভাইজানের খবর কী, তার বউয়ের চরিত্রে দোষ আছে কি না, সন্তানসন্ততি হইছে নাকি কিছু–এমন বাজে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে আমাকে। ভাইজানের ঘটনা এ এলাকার লোকরাও জানে। জনপ্রিয়তা তার ভালোই মনে হয়।
খাওয়া শেষ করে সবাইকে এড়িয়ে আমি আর আইয়ুব খালপাড়ের দিকে চলে গেলাম।

এদিকটায় ভিড় কম । অল্প কয়েকটা বাচ্চা ছেলে আছে । তারা গাছ থেকে পড়া শরীফা ফল নিয়ে ঝগড়া করছে ।
আইয়ুব একটা বিড়ি ধরায় । আমিও কষ্ট করে তাতে দু-একটা টান দিই । বুকের ভেতর চাপ চাপ কষ্ট । ধোঁয়াতে একটু হালকা হয় । ধূমপানের অভ্যাস নাই । ধোঁয়া গলা দিয়ে ভেতরে যেতেই কাশি আসে ।
খালপাড়ে নৌকা বাঁধা আইয়ুবের । ছইয়ের ভেতর গিয়ে বসি দুজন । গামছাটা মুড়িয়ে বালিশের মতো করে দেয় আমাকে আইয়ুব । আমি মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়ি ।
এই ছায়া মাখানো দুপুরে আশপাশে কেউ নেই । ঘুম পায় খুব । ঘুম ঘুম ভাবটা দূর করে দেয় আইয়ুব । কথা শুরু করে সে ।
'ভাইজান আইজ রাইতে আইবো এই বাড়ি ।'
'কস কী ।' আঁতকে উঠি আমি আইয়ুবের কথায় । বুঝি কঠিন বিপদ আসছে । কঠিন বিপদ ।
'আমারে টাকা দিছে ছয় শ । কইছে রাইতের বেলা এই পাড়ে নামায় দিতে । কাউরে এই কতা জানাইতে নিষেধ করছে ।'
'টাকা কই?'
'আছে । লুঙ্গির খোঁটে রাখছি ।'
' টাকাটা রাখ । আর আমি আরো দুই শ দিতাছি । ভাইজানরে আনার দরকার নাই । আইজ রাইতে তুই বাসায়ই থাকবি না । ভাইজানের ব্যাপারটা মারে জানানো দরকার । নৌকায় বয় তুই । আমি আইতাছি ।'
আইয়ুবকে বসিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম আমি । বিড়ি দিয়ে আসতে খেয়াল নেই । আমার দুই আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে বিড়িটা । অস্থির লাগছে ।
ভাইজানের পাগলামি শুরু হয়েছে । বড় কোনো বিপদ ঘটার আগেই ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে । বাড়ির ভেতর যেতেই দেখলাম খাবার নিয়ে ঝামেলা বাধিয়েছে মা । চিৎকার করছে লোকজনের সাথে । দৌড়ে গিয়ে থামাতে যাব এমন সময়ই দেখি এসে পড়েছে নিশা আপা । তিনি আসতেই ঠাণ্ডা সব । মা-ও চুপ ।

মাকে নিয়ে তার নিজের ঘরে গেল আপা। আমিও গেলাম পিছু পিছু। তারপর আপার ঘরের জানালা দিয়ে লুকিয়ে দেখলাম কাঁদছে মা। নিশা আপা জড়িয়ে ধরে আছেন তাকে। চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মা কাঁদতে কাঁদতে বলেই যাচ্ছেন, 'তোর পেটের সন্তানটা আমার পোলারও হইবার পারত। পোলারও হইবার পারত। ক্যান আউলাঝাউলা হইয়া গেল সব। এমুন ক্যান হইল..।' জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল আমার। কী বলতে এসেছি ভুলে গেলাম। ইশ্, ভাইজানটা নেই এখন। থাকলে এই দৃশ্য দেখে খুশি হতো খুব।
খুব, খুব, খুব।

**১০.**

আবহাওয়াটা বড় চমৎকার ছিল সেদিন। আকাশে মেঘ ছিল না। ছিল না রোদ। শান্ত ছিল বাড়ির সামনের পুকুরটার জল।
বাবা তখন কালিশুরি বাজারে নতুন দোকান দিয়েছেন। জমিজমা, দোকানের কাজ–এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে।
স্ত্রী আছিয়ার বয়স চৌদ্দ কি পনেরো। পেটে চার মাস বয়সী বাচ্চা।
আছিয়া খাতুনের মাথাভর্তি চুল। দুধে আলতা গায়ের রং। হরিণ চোখের অধিকারিণী এই নারীর রূপের সাথে পাল্লা দেয় এমন কাউকে সাতগ্রাম খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।
কথায় আছে, অতি সুন্দরীর কপাল মন্দ। আর কেউ না হোক আছিয়ার ক্ষেত্রে এই কথা সত্য হলো। বাচ্চা পেটে আসার পর থেকেই পাগলামি শুরু করলেন তিনি। মাথায় ঝামেলা দেখা দিল। কারণ ছাড়াই হঠাৎ কেঁদে উঠতেন কিংবা হাসতেন। রাতে চিৎকার করতেন আর প্রলাপ বকতেন।
লোকে বলল, জিনে আছর করেছে। এমন সুন্দর নারীতে জিনের বড় লোভ। বাবা স্ত্রীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। পীর, হুজুর ঝাড়ফুঁক দিল। লাভ হলো না কোনো। আছিয়া চমৎকার আবহাওয়ার দিনটায় আসলেন পুকুর ঘাটে।

পুকুরে মেয়েদের জন্য রয়েছে আলাদা ঘাটের ব্যবস্থা। কলাগাছের শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ঘাট। মেয়ে মানুষের পর্দার জন্য করা হয়েছে এমন। আশপাশে কেউ ছিল না। একা আছিয়া নেমে পড়লেন পুকুরের জলে। সাঁতার জানা ছিল তার। তবে তিনি সাঁতারের চেষ্টা না করে যেতে লাগলেন পুকুরের গভীর থেকে গভীরে।

দুপুরের শেষভাগে পেট ফোলা লাশ দেখতে পায় লোকজন। শুরু হয় হৈচৈ। বাবা জানতে পারেন সন্ধ্যার দিকে। তার এক আত্মীয় কালিশুরি গিয়ে জানান খবরটা। ভেঙে পড়েন বাবা।

নিজের প্রথম সন্তান হারানোর শোক বড় কঠিন। বউ গেলে বউ পাওয়া যায়! সন্তান কি আর পাওয়া যায়?

আছিয়া মারা যাওয়ার দুই মাসের মাথায় বিয়ে করেন বাবা। দাদার মতো তারও দুই বিয়ে। আজব মিল! নতুন বউয়ের ঘরেই জন্ম আমার আর ভাইজানের। এই গল্প অবশ্য বাবার কাছ থেকে শোনা। বাবা বলেছেন অন্যের কাছ থেকে এই গল্প না শুনতে। কারণ বাইরের লোক গল্পটা ভিন্নভাবে বলে।

তাদের ধারণা, বাবার কারণেই মরেছে আছিয়া নামের রূপবতী নারীটি। তার অনেক সম্পত্তি।

তা ছাড়া বাবার সাথে প্রেমও ছিল নাকি আমার মায়ের। স্বামীর অন্য নারীর সাথে সম্পর্ক দেখেই মনের দুঃখে জলেতে ডুব দিয়েছিল আছিয়া খাতুন। এসব আজগুবি কথা। আজগুবি না হলে আমার সৎ মা আছিয়া খাতুনের প্রতিটি মৃত্যুদিনে বাবা মন খারাপ করে কাটাতেন না। লোকদেখানো ব্যাপার অল্পতেই শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর এত দিন পরও বাবা এই দিনে সারা দিন ঘরে বসে থাকেন। সকাল থেকে রাত অবধি তেমন কিছুই খান না। আমাদেরও তাকে বিরক্ত করা মানা।

আজ আছিয়া খাতুনের মৃত্যুদিন। আছিয়া খাতুনের প্রতি মায়েরও কেন জানি রয়েছে গভীর মমতা। তিনি সকাল থেকেই কোরআন তেলাওয়াত করছেন। গতকাল ভাইজানের শালা এসেছে। লঞ্চ পৌঁছেছে অনেক রাতে। তখন ঘুমোচ্ছিলাম।

তপন নামের ভাবির এই ভাইটির সাথে পরিচয় নেই আমার। তাকে যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেখানে গিয়ে দেখলাম মরার মতো পড়ে ঘুমাচ্ছে লোকটা।

শীত লাগছে। বিছানার চাদরটাই গায়ে জড়িয়ে বের হয়েছি। সাতসকালেই ঘুম ভেঙেছে আমার। বাইরে হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। ভোট গ্রহণের দিন আজ। বাড়ির সামনেই কেন্দ্র পড়েছে। পুলিশ, প্রার্থী, ভোট দিতে আসা লোকজনে ভর্তি হয়ে আছে উঠোনটা।

কমলেশের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। নিজের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য মরিয়া সে। বিরোধী প্রার্থী কঠিন লোক। তিনি জিতলে এলাকা থেকে হিন্দু খেদাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আগাছা রেখে লাভ নেই। তার ধারণা, হিন্দুদের দেশ ভারত। তারা থাকবে সেখানে। এখানে এসে মুসলমানদের ধর্মকর্মে বিরক্ত করার মানে হয় না।

ভাইজানের ঘরে গেলাম। এই কদিনেই শরীর ভেঙে গেছে। বসে গেছে চোখ। চোখের নিচে কাকের পায়ের ছাপ। শরীরের রং হয়েছে ময়লা। ঘুমাচ্ছে লোকটা। দীর্ঘ ক্লান্তির পর শান্তির ঘুম।

আমি বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম। হাত বুলিয়ে দিলাম তার কপালে।

'ঘুম হচ্ছে না রে।' ভাইজান জেগে আছেন বুঝিনি। কথা বলতেই সরিয়ে নিলাম হাতটা।

'ঘুমান। ঘুম দরকার।'

'বাইরে কিসের হৈচৈ? '

'ভোট। কেন্দ্র পড়ছে। লোকজন ভিড় করছে।'

'তুই দিবি না ভোট?'

'দূর, আমি এইসবে নাই।'

'থাকতে তো হবে। সাধারণ মানুষের মতন সব কিছুতে থাকবি। না থাকলে ক্যামনে হবে।'

'বাদ দেন।'

‘কি করবি ঠিক করলি কিছু?’ বিছানা থেকে অনেক কষ্টে উঠে কথাগুলো বললেন ভাইজান। ঠাণ্ডা লেগেছে তার। খুকখুক করে কাশি দিচ্ছেন।
‘কী করার কথা কন?’
‘পড়াশোনা তো আর করবি বইলা মনে হয় না। চাকরির তো খোঁজ করা লাগে। আমি তো নাই। বাড়ির আর দুইটা লোকরে কে দেখবে। বয়স হইছে তাগো।’
‘তাগোর চিন্তা তারা করবে। আমারে ঝামেলায় ফেইলেন না তো ।’ মেজাজ খারাপ লাগে আমার। ‘তপন ঘুমায়? তোর সাথে তো পরিচয় নাই। ছেলে ভালো।’ কথা ঘুরায় ভাইজান। হাফ ছেড়ে বাঁচি আমি। জীবন-জীবিকার কথা শুনতে ভালো লাগে না।
‘হুম। কী জন্য আসলো সে?’
‘তোর ভাবি পাঠাইছে। রাতে তুই তো ঘুমায় ছিলি, তখন লঞ্চঘাট দিয়া নিয়া আসছে ওরে কমলেশ।’ ‘আপনারে নিয়া যাইতে আসছে?’
‘হ। যাইতে তো হবে রে। তোর ভাবির তলব। তা ছাড়া অনেক দিন হইলো আসছি। তোর ভাবি মেয়েটা ভালো বুঝলি। শুনবি তার কথা।’
‘হু।’ মুখ শুকনো করে বললাম।
‘রুবেলের কথা মনে আছে তোর?’
‘আপনার বন্ধু রুবেল?’ বাইরে চিৎকার করছে লোকজন। জানালাটা আটকালে পরে শব্দ কমে যায়। আমি বিছানার ওপর আরাম করে বসি ভাবির কথা শোনার জন্য। তার সম্পর্কে জানা দরকার। তপন ছয় ফুট লম্বা দানবের মতো দেখতে। ভাই যখন এমন তখন বোনের আকার-আয়তনও ভালো হওয়ার কথা না। আমি শঙ্কিত বোধ করি।
‘রুবেল পরিচয় করায় দিছিলো তোর ভাবির সাথে। বয়সে বড় সে আমার। কী একটা কারণে পড়াশোনা বাদ দিছিলো দুই বছর। আমার আর রুবেলের সাথে পড়া শুরু করে আবার।’
‘পড়াশোনা বাদ দিল ক্যান?’

‘পরীক্ষায় একবার খারাপ করায় ভাইঙা পড়ছিল । তা ছাড়া বাড়ি থেকে বিয়ের চাপও দেওয়া হইত । ঘুমের ওষুধ খাইত খুব । একসময় ওষুধের ব্যাপারটা অভ্যাস হইয়া গেল ।’

‘ভালো । ঘুমের ওষুধ খাওয়া ভালো ।’ হাই তুলে কথাটা বললাম আমি । ভাইজান ভালো গল্প বলেন না । আমি এর মাঝেই বিরক্ত হয়ে গেলাম । আমার অল্পতেই বিরক্তি ।

‘বিরক্ত হলি?’

‘না না । বলেন ।’

‘তোর ভাবি যাতে ঘুমের ওষুধ খাওয়া ছাড়ে তাই পরিবার থেকে তারে আবার পড়াশোনা করতে বলল । পড়াশোনা নিয়া ব্যস্ত থাকলে আর এইসবের টাইম নাই । একই এলাকার বইলা রুবেলের সাথে পরিচয় ছিল । আমি থাকতাম মেসে । রুবেল একদিন ক্লাস শেষে ডাইকা পরিচয় করাইল । এরপর কথা হতো প্রায়ই । আমি পড়াশোনায় ভালো । তোর ভাবি পড়াশোনায় সাহায্যের জন্য আসত প্রায়ই । তারপর ক্যামনে ক্যামনে জানি হুট কইরা বিয়াটা হইয়া গেল । তোর ভাবিই জোর করছিল ।’ ‘বিয়ের কথা জানত না কেউ?’ অবাক হয়ে বললাম আমি । কাহিনী জমতে শুরু করছে । আগ্রহ পাচ্ছি এতক্ষণে ।

‘কাছের কয়েকজন বন্ধু ছাড়া জানত না কেউ আর । তহন তো বাড়ি ছাইড়া চইলা গেছি । টাকা ছিল না পকেটে । এমুন সময় বৃত্তি পাইলাম বিদেশের একটা ভার্সিটি হইতে । তোর ভাবির কিছু গহনা ছিল । সেগুলা বিক্রি কইরা গেলাম বিদেশ ।’

‘ভাবি তহন কই?’

‘ভাবি তোর বাড়িতেই তহন । পড়াশোনা করত । আমি বিদেশ যাওয়ার পর যোগাযোগ কইমা গেল । যোগাযোগ কমায় ঘুমের ওষুধ খাওয়া শুরু করল সে আবার । কাজ কইরা কিছু টাকা জমাইছিলাম বিদেশে । অবস্থা খারাপ দেইখা সেই টাকায় তোর ভাবিরে নিয়া আসলাম বিদেশ । তত দিনে তার বাড়িতে জানাজানি হইয়া গেছে । তবে বিয়ে নিয়া কেউ তেমন আপত্তি করে নাই ।’

এইটুকু বলার পর ভাইজান কাশি শুরু করল। ঠাণ্ডা ভালোই লেগেছে তার। গলায় কফ জমেছে। পানি খাওয়ার কিছুক্ষণ পর থামল কাশি।
'আইজ আর থাক ভাইজান।' শরীরের খারাপ অবস্থা দেখে বললাম। ডাক্তার দেখানো দরকার। বিকেলে তারে নিয়ে বাজারের ডাক্তারের কাছে যাব একবার ভাবছি।
'ঠিক আছি আমি। ঠিক আছি। চিন্তা করিস না। শোন, তোর ভাবি বিদেশে গিয়া ঠিকই আছিল প্রথম দিকে। কিন্তু আমি সারা দিন থাকি কাজে আর সে বাসায়। একা একা থাকতে থাকতে মাথা বিগড়াইল আবার। তাই বাচ্চা নিলাম। একটা মানুষ পাবে সাথে থাকার তাই।'
'আইজ বাদ দ্যান ভাইজান। শরীরের অবস্থা ভালো না আপনার।' কথাগুলো বলতে গিয়ে ভাইজানের কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়। আজকের মতো থামা উচিত। তা ছাড়া বাইরের  গোলমালটা বাড়ছে। পুলিশ একটু পর পর বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে।
এই কেন্দ্রে প্রতিবারই মারপিট হয়। হয় ব্যালট বাক্স ছিনতাই। এবারও তেমনই হবে বলে মনে হচ্ছে। একটু দেখে আসা উচিত বাইরে কী অবস্থা। কমলেশটা না ঝামেলায় জড়ায় আবার!
'বাচ্চা নিয়াও লাভ হয় নাই। তোর ভাবির ঘরেতে মনই নাই। সে থাকে বাইরে বাইরে। বাইরেই তার আনন্দ। এক সময় বিদেশে থাকার মেয়াদ ফুরাইল আমার। পড়াশোনা করার জন্য আসছিলাম। কিন্তু কিছুই লাভ হয় নাই। তোর ভাবির পেছনে খরচ করতে হইত অনেক। বাচ্চা হওনের পর খরচ বাইড়া গেল আরো। দিন-রাত দুই শিফটে কাজ করতাম। পড়াশোনার সময়ই নাই।'
'ক্যান করলেন এই ভুল?' বললাম আমি।
'হা হা। আমার জীবনটাই তো ভুলে ভরা রে। কী করা, কপাল যে খারাপ। তারপর শোন, অই বিদেশের একটা গ্রামের দিকে বউ-বাচ্চা নিয়া চইলা গেলাম। অইদিকে পুলিশটুলিশ আসত না তেমন। তবে লাভ হইলো না। ধরা পড়লাম একদিন। গেলাম জেলে। মেয়েটা নিয়া গেল মানবাধিকার কর্মীরা। বউ কই জানি না। পকেটে টাকা নাই। জামিন করানোর কেউ নাই। আশপাশের

পরিচিত মানুষের কাছে অনেক ধার নিছিলাম। তারা কেউ সাহায্য করতে আসলো না। কঠিন দিন রে। কষ্টের দিন।'
ভাইজানের কথা শুনে থ হয়ে গেলাম। কিছুই বললাম না আমি। এই সময়ে কিছু বলারও নাই। লোকটা কষ্ট পেয়েছে অনেক। পাপের শাস্তি পেয়েছে। একটু থেমে ঢোক গিলে কয়েকবার কাশি দিয়ে ভাইজান আবার কথা শুরু করল।
'মেয়েটা মারা গেল বুঝলি। মারা যাওয়ার আগে দেখার সুযোগ হইছে। আমারে ভুইলা গেছিল। মা, মা কইরা ডাইকা তার কাছে যাই; কিন্তু আমারে সে চিনে না। শুরু করে কান্নাকাটি। একটা সময় ভয় পাইত। আমারে দেখলেই দিত চিৎকার। তার কবরে আমি মাটি দেই নাই। জেল থাইকা কবর দেবার জন্য অনুমতি পাইছিলাম। মরা মাইয়ার মুখ দেইখা সহ্য করতে পারব না দেইখা যাই নাই। মেয়ে মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরই পুলিশ দেশে পাঠায় দেয় আমারে। তোর ভাবির খোঁজ তহনও পাই নাই। দেশে আসার পর একদিন জানতে পারলাম বিদেশে পাতানো এক বড় বোনের বাসায় ছিল সে। ভাইঙ্গা পড়ছিল খুব। নিজে যোগাযোগ করে নাই আর সেই বড় বোনরেও নিজের কথা কাউরে জানাইতে নিষেধ করছে।' কথা বলে থেমে যায় ভাইজান। চোখে তার জল। আমি নিশ্চিত এ কান্না তার মেয়ের জন্য।
'তোর ভাবিরেই ফোন দিই আমি বিদেশে। মেয়েটা ভালো। ভালোবাসে আমারে। তবে মাথায় একটু ঝামেলা আছে। অনেক জোরাজুরির পর এত দিনে দেশে আসছে সে। আমারে নিতে পাঠাইছে তপনরে। জীবন তো আর থামে না। তার সাথে কথা কইয়া দেখি কী চায় সে। নতুন কইরা জীবন শুরু করার সাহস পাই না আর। তার সাথে আবার মনে হয় বিদেশ যাইতে হবে। দেশ তার পছন্দ না। এখন যা তুই। কথা বইলা মন হালকা হইছে আমার। এখন বিশ্রাম নেব।' কথা শেষ হলে দেখি ভাইজানের চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।
আমি উঠে বের হই বাইরে। ভাইজান এখন একা থাকবে। এখন তার একা থাকার সময়।

বের হতেই চোখে পড়ে কমলেশকে। দৌড়ে এসে আমাকে বলে, 'ভোট দিছস্? সাতটা দিলাম আমি। জাল ভোট। হা হা।'
আমি কমলেশের কথার জবাব না দিয়ে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমার চারপাশের মানুষগুলো আসলে মন্দ না। সবাই ভালো। খুব ভালো। আমিও তাদের মতো ভালো হতে চাই। তাদের মতো জীবনে কষ্ট পেয়েও বেঁচে থাকতে চাই। সুখী থাকতে চাই। কিন্তু হয় না। আমাকে দিয়ে ভালো মানুষ হওয়া হয় না। ভালো মানুষ হওয়ার লড়াইয়ে সবাই আমাকে হারিয়ে দেয়। হেরে যাই আমি। হেরে যাই।

**১১.**

বাবার ঘরে আছেন কাকিমা আর কাকা। ঘরে মুড়ি আর চা দিয়ে আসা হয়েছে। সেই সকাল থেকে কথা বলছেন তারা। এখন দুপুর। মনে হয় খেয়ে যাবেন দুপুরে।
আমার ঘরে কমলেশ। তার মন খারাপ।
ভাপসা গরম বাইরে। দিনের বেলা ঘণ্টাখানেক বিদ্যুৎ থাকে। ছোট্ট টেবিল ফ্যানটা চলছে। তবে লাভ হচ্ছে না। এই গরমকে ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা এমন ফ্যানের নেই। উদোম গায়ে বসেও ঘামছে কমলেশ। দুজনেই চুপচাপ বসে আছি। কথা বলছি না। ভোটের পরদিন সব নীরব হয়ে আছে। দুপুর পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে পুরো গ্রাম।
গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত বিজয় মিছিল হয়েছে। ক্লান্ত মানুষগুলো এখনো হয়তো তাই বিছানা ছাড়েনি। কমলেশের দল হেরে গেছে। কিন্তু এ নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।
গতকাল রাতে বিজয় মিছিলে সেও ছিল। নবনির্বাচিত মানুষটির পক্ষে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছে। গ্রামের মানুষগুলো এমনই। ঝগড়া যেমন করে আবার সব ভুলে গিয়ে মিলে যেতেও এদের সময় লাগে না।
হয়তো দেখা যাবে আগের দিন যে শত্রু ছিল সেই তার পাশে বসেই একসাথে খাওয়া হচ্ছে সেমাই-পিঠা। হিন্দুরা এখানে ভালোই থাকবে। মিলেমিশে থাকবে

সবাই। ভোটের আগে যা কিছু বাজে বলা হয়েছে ভুলে যাবে চেয়ারম্যান ও মেম্বার। এখানে হানাহানি ঠিকই আছে; কিন্তু তার তুলনায় ভালোবাসা আছে অনেক বেশি। ওই শহর থেকে নোংরামি, বিভেদ, স্বার্থপরতা এসে এখনো ছোট্ট গ্রামটিকে ছুঁতে পারেনি ঠিকমতো। গ্রামের মানুষগুলো ভালো আছে। সত্যিকারের বাঁচা বেঁচে আছে।

রাজহাঁসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের দরজা থেকেই দেখা যায় ওদের। মা বাটিতে করে শামুক দিয়েছে একটু আগে। কেউ খাচ্ছে কেউ খাচ্ছে না। গরমের ভেতর কয়েকটা হাঁস নেমে পড়েছে পুকুরের জলে। তাদের সাদা শরীরের দিকে একটানা তাকালে চোখ ধাঁধায়।

আমার কেন জানি পুতুলের কথা মনে পড়ে। পুতুলের যেদিন জন্ম সেদিন ঝড় হয়েছিল। কালবোশেখি ঝড়।

মা হাসপাতালে যাবেন না বলে ঠিক করেছেন। আমাদের দুই ভাইয়েরই জন্মের সময় ধাত্রী ছিলেন। মা তাই এবারও ধাত্রী দিয়েই কাজ সারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। বেশি বয়সে বাচ্চা নিলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। পুতুল পেটে আসার পর মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নিশা আপার জোরাজুরিতে আর মৃত্যুভয় দেখা দেওয়ায় তিনি হাসপাতালে যেতে রাজি হন। পুতুল আসায় আমি আর ভাইজান কেউই খুশি ছিলাম না। দুজনেই তো ভালো ছিলাম, কী দরকার ছিল এই বুড়ো বয়সে পুতুলকে আনার?

নিশা আপার প্রতিটি আদেশ মুখ ভার করে শুনেছি সেদিন। ঝড়ের ভেতর ভ্যানে যাওয়া হয় হাসপাতালে। ঝড় শেষ হওয়ার পর শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। হাঁটু পর্যন্ত পানি হয় পথে। সে অবস্থায় দুই ভাই, বাবা আর নিশা আপা মিলে পেছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাই কাদায় আটকে যাওয়া ভ্যানটি। যে মেয়েটি পৃথিবীতে আসার সময় এত যন্ত্রণা দিয়েছে তার বাবা, ভাইদের তাকে নিয়ে আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না; বরং রাগ ছিল।

তবে এই রাগ থাকেনি বেশিক্ষণ। যখন ওকে প্রথম দেখি, নিজের বোনকে কোলে নিই প্রথম তখন অবাক লাগছিল এই ভেবে যে একটা মানুষ এত ছোট হয় কী করে। একদম পুতুলের মতো ছোট। এই মেয়েটার নাম পুতুল আমিই

দিয়েছিলাম। আমরা সবাই পুতুলকে একটু বেশিই ভালোবাসতাম। পুতুলকে কে কোলে নেবে, কার তাকে আদর করার অধিকার বেশি–এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই ঝগড়া হতো আমি, নিশা আপা আর ভাইজানের মধ্যে।
মা তো প্রায়ই হেসে বলতেন, 'আমি হইলাম মা আর আমিই নিজের মাইয়ারে কাছে পাই না। তোগের জ্বালায় কোলেও নিতে পারি না শান্তিমতন। যা মাইয়া দিয়া দিলাম। তোরাই দেইখা-শুইনা রাখ।' পুতুলের জন্মের দিন থেকেই রাজহাঁস পোষা শুরু করে সে। আমরা পুতুলকে নিয়ে থাকতাম আর মা রাজহাঁস নিয়ে। পুতুলেরও রাজহাঁস পছন্দের ছিল। হাঁটতে শেখার পর থেকেই দিনের অনেকটা সময় সে রাজহাঁসের পেছনে কাটাত। তাদের সাথে এদিক ওদিক ছুটত। মুখে খাবার তুলে দিত। মারা যাওয়ার দিনও রাজহাঁসের সাথে কেটেছে অনেকটা সময়। পুতুল নেই; কিন্তু রাজহাঁসগুলো দিব্যি টিকে আছে। বাচ্চা হয়েছে কয়েকটা। দল ভারী হয়েছে তাদের। সবই আছে ঠিকঠাক। পুতুল নেই শুধু। পুতুলের অনুপস্থিতি আমাকেই মনে হয় পোড়ায় সবচেয়ে বেশি।
ভাইজান তপনকে নিয়ে বেরিয়েছেন অনেক আগে। তার শরীরটা ভালো একটু এখন। তপন এর আগে কখনো গ্রামে আসেনি। তাকে গ্রাম দেখাচ্ছেন তাই।
দুপুরে খাবারের ডাক পড়তে গেলাম আমি আর কমলেশ। মা মাদুর পেতে দিয়েছেন। কাকিমা আর কাকা খেতে বসেছেন। বাবা বসে আছেন পাশে। তিনি একটু পরে খাবেন।
'কমলেশরে একটু বোঝাও বাবা। তার কাকার অবস্থা ভালো না।' ভাতে ডাল মেশাতে মেশাতে কথাগুলো বললেন কাকা।
আমি ঘটনার কিছুই জানি না। কমলেশকে কী বোঝাব কে জানে। তবুও মাথা নেড়ে, 'জি আচ্ছা। জি আচ্ছা' বললাম।
'আমি যামু না। ঘর খালি রাইখা কলিকাতা যাওনে আমি নাই। আপনেরা যান।' মুখ ভার করে বলল কমলেশ।
'ক্যান যাবা না? তোমার কাকা সেই ছুটোবেলায় একবার দেকছে তুমারে। মরার আগে সবাইরে একসাথে দেকার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। আত্মীয় হিসাবে তার ইচ্ছা

পূরণকরন তোমার দায়িত্ব।' কথা বলা শুরু করেন বাবা। কমলেশকে তিনি পছন্দ করেন না। বিধর্মীদের প্রতি এমনিতেই তার রয়েছে বিতৃষ্ণা।
আমি নিশ্চিত কমলেশের বাবা জমি বিক্রি করতে এসেছেন। তার নগদ টাকা নেই; কিন্তু জমি আছে। কলিকাতা যেতে নগদ টাকা লাগবে।
জমি কিনে বাবা খুব আনন্দ পান। এই সময় তার মন ভালো থাকে।
'বেশি দিনের তো কথা না। মাস দুয়েক থাকতে হইব। বউটা রাজি। কিন্তু পোলাটাই ঝামেলা করতাছে আমার।' কমলেশকে নিয়ে বলেন কাকিমা।
'সবাই গ্যালে বাড়ি পাহারা দিব কে?' বলল কমলেশ।
'তা নিয়া তোর চিন্তা করন লাগত না। ভিটাবাড়ি দেখনের অনেক লোক আছে।' খেঁকিয়ে উঠে কথা বলে কাকা। কথা বলার সময় ডাল মাখানো অল্প কিছু ভাত বের হয়ে পড়ে মাদুরে। সেগুলো তুলে আবার মুখে দেয় কাকা।
'যামু না আমি অদ্‌দুরা। তোমরা যাও। বউরেও নিয়া যাও।'
'কী কস এইগুলা। রাগ উঠতাছে কিন্তু আমার।' খাওয়া ছেড়ে উঠে যান কাকা। বাবার সামনেই লাথি তোলেন কমলেশের দিকে। বড় হওয়ার পরও হাত তোলেন তিনি ছেলের গায়ে। তাদের পরিবারে এটা অস্বাভাবিক কিছু না। লাথি তুলতে গিয়ে ধুতি খুলে যায় কাকার। অনেক কষ্টে সামলান তিনি সেটা। এই সময়ে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা চলে না। আমি আর বাবা থামাই কাকাকে। এমন পাগলামি করার জন্য বাবা ধমক দেন কমলেশ আর কাকাকে।
কাকা শান্ত হয় ধীরে ধীরে। খেতে থাকেন চুপচাপ। মা সবার পাতে তুলে দেন মাছ। আমার খাওয়া শেষ হয় দ্রুত।
ইদানীং একটা বদঅভ্যাস হয়েছে। খাওয়া শেষে বেশি জর্দা দিয়ে বানানো পান দিতে ইচ্ছে করে মুখে। বের হলাম বাইরে। বাড়ি থেকে একটু দূরে ইশকুল ঘরের পাশেই ছোট্ট দোকান আছে একটা। সেখানে দোকানদার খুব ভালো করে পান বানায়। দোকানে গিয়ে একটা পান নিয়ে মুখে দিতেই দেখি কমলেশ এসে হাজির। মুখের গোমড়াভাব কাটেনি এখনো। আমার পাশে বসে চা খেতে শুরু করে। ঠিকমতো ভাত খায়নি, বোঝা যায় তার মুখ দেখেই।
'যামু না আমি। কলিকাতা যামু না।'

'আচ্ছা যাইস না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ।' দোকানের পাশেই পানের পিক ফেলে বললাম আমি।

'বাপে আর আইব না। তার মতলব কলিকাতা থাইকা যাওয়া। জমিজমা বিভিন্ন লোকের কাছে অর্ধেকের বেশি বিক্রি কইরা দিছে।'

'এই কাহিনী তো জানতাম না।' অবাক হয়ে বললাম।

'তুই কী জানবি, আমি নিজেই জানতাম না। বউয়ের কাছে শুনলাম গতকাল।'

'চিন্তা করিস না। এত দিনের থাকনের জায়গা ছাইড়া যাওন এত সহজ না।'

'সেইটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এত জমি বিক্রির কারণ কী? কলিকাতা যাইতে কি এত টাকা লাগে?' চা খাওয়া শেষ করে আমাকে প্রশ্নটা করে কমলেশ।

'লাগে হয়তো। আমি কী আর ছাই জানি ! তোর সাইকেলটা কই?' পান খাওয়া শেষ। কলেজের দিকে যেতে হবে। কমলেশের সাইকেলটা পেলে আরামে যাওয়া যাবে। এই সাইকেল বিয়েতে যৌতুক পেয়েছে সে। চালাতে পারে না বলে বেশির ভাগ সময়ই পড়ে থাকে বাড়িতে। আমিই চালাই। সাইকেলের কথা শুনলেই কমলেশ খুশি হয় খুব। শ্বশুরবাড়ি থেকে দেওয়া প্রতিটা জিনিসই তার অতি প্রিয়।

কলিকাতার শোক কাটাতেও কথাটা কাজে লেগেছে, তা তার হাসি দেখে বোঝা যায়। মুখের দুই পাটির সর্বোচ্চ যতগুলো দাঁত দেখানো যায় সব বের করে সে বলে, ' কই যাবি? সাইকেল ঠিক আছে। ভরপুর পাম দেওয়া আছে। বাড়ি থাইকা নিয়া আসি চল। দু-তিন মিনিট লাগবে।'

দোকানদারকে দাম মিটিয়ে বের হই দুই বন্ধু। সাইকেলটা নিয়ে একসময় রওনা দিই কেশবপুর ডিগ্রি কলেজের দিকে। মাটির এবড়োথেবড়ো রাস্তায় সাইকেল চালাতে ভালোই লাগে।

'সাবধানে চালাইস। চেইনটা ঢিলা। বারবার নাকি পইড়া যায়।' পেছনে বসে বলল কমলেশ।

'তুই জানলি কেমনে? তুই তো চালাস না।'

'বউ বলল। সে সাইকেল চালাতে জানে। মাঝে মাঝে অনেক রাত্তিরে বের হয়। আমি থাকি সাথে।'

'হা হা। ভালো তো। বউ চালায় আর জামাই পেছনে বসা থাকে।' আমি নিশ্চিত কমলেশ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে। পেছনে বসে থাকায় মুখটা দেখা গেল না। হাসতে হাসতে ফুরফুরে মেজাজে কথা বলতে বলতে সাইকেল চালাতে লাগলাম আমি।

'কলেজে ক্যান যাস?' বলল কমলেশ।

'কাগজপত্র উঠান লাগবে কিছু।'

'ঘটনা কি তাইলে সত্য?'

'কিসের ঘটনা?'

'জহর ভাইয়ের সাথে দেখা হইছিল ছিটকা বাজারে। কইল টাকা চাইচোস তুই। বিদেশ নাকি যাবি। কলেজে কাগজপত্র তুলতে যাইতাছোস তো বিদেশে যাবার জন্যই, তাই না?'

প্রশ্নটা শুনে চুপ হলাম আমি। কমলেশ ঠিকই ধরছে। বিদেশে যাওয়ার টাকা চাইতে গেছিলাম জহর ভাইয়ের কাছে। তার পেটে কথা থাকে না। কাজটা ঠিক করেন নাই। কথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। কেউ জানলেই বিপদ।

কমলেশ আবার কথা শুরু করল। বলল, 'সব কিছু এমন আউলাঝাউলা ক্যান হইতাছে বন্ধু। বাপ চইলা যাইতে চায় কলিকাতা। তুইও কাউরে না জানায় বিদেশ যাবার ফন্দি করছোস্। আমি ক্যামনে থাকব ক দেকি?' কমলেশের গলা ভারী হয়ে আসে। হয়তো চোখ হতে গড়িয়ে পড়ছে দু-এক ফোঁটা জল। সামনে বসেছি বলে দেখতে পাই না আমি।

আসলেই সব কিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। দুঃখ বাড়ছে। কষ্ট বাড়ছে। তবে সব সময় এসব নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে না। এই যেমন এ মুহূর্তে ছোট্টবেলার বন্ধুটাকে পেছনে বসিয়ে সাইকেল চালাতে ভালো লাগছে খুব। এটা নিয়েই ভাবতে চাচ্ছি শুধু।

দূরের কাঠের পুলটা পার হলেই কেশবপুর ডিগ্রি কলেজের মাঠ। তার থেকেও দূর দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে ময়ূরকণ্ঠী নীল আকাশ। এমন নীল তো চোখে পড়ে না সচরাচর!

সাইকেলের মুখ ঘুরালাম। আজ আর কলেজে যাব না। আজ সাইকেল চালাব। যতক্ষণ চালানো যায় ততক্ষণ। যতক্ষণ ক্লান্ত হব না ততক্ষণ। দুই বন্ধু আজ ঘুরব। পথে পথে কাটবে আজকের দিন।
কমলেশের সাথে আর সাইকেল চালানোর সুযোগ হবে না হয়তো। হয়তো বন্ধুটা আমার থিতু হবে কোলকাতায়। ফিরবে না আর।
আমার আশঙ্কা, হয়তোগুলো সত্যি হয়ে যায় সব সময়। এবারও হবে জানি। ঠিক ঠিক জানি। খুব বলতে ইচ্ছে করে গাধা বন্ধুটাকে, 'কমলেশ, তুই ছাড়া ক্যামনে হবে? ক্যামনে থাকব? তুই আমার প্রাণের বন্ধু। তুই আমার কইলজার টুকরা বন্ধু।'
বলা হয় না।

## ১২.

'ডায় ডায় ডায়, বায় বায় বায়...' কামলাদের গলার আওয়াজ পাই। ধান মাড়ানোর কাজ চলছে। গরুগুলো সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছে। কেউ কেউ সিদ্ধ করছে ধান। সারা দিন চলবে এমন। বাবা উঠোনে বসে তদারকি করছে সব । ভাইজান তার পাশে বসা। চিতই পিঠায় খেজুরের গুড় মাখিয়ে খাচ্ছে দুজন।
ঘরের দরজা লাগোয়া কাগজি ফুলের ঝোপটা বড় হয়েছে অনেক। পেঁপে গাছটায় পাকা পেঁপে। নুয়ে পড়েছে ডালগুলো। একটা পেঁপে ছিঁড়ে কেটে বাবা আর ভাইজানকে দেয় মা। একটু পরে তপন আসে। বসে যায় খেতে।
সূর্যের রং এখন লাল। কটকটা লাল। ধুলোর মতো সোনালি আলোর কণা উড়ছে চারপাশে। ভোর যেন আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। বাইরে বের হতেই দেখলাম বেদেদের আনাগোনা। বছরের এই সময়টায় তারা এদিকে আসে। বাড়ি বাড়ি হানা দেয়। সাপের খেলা দেখায়।
কামলা রব চাচার কোমরে যন্ত্রণা অনেক দিন ধরে। বেদেদের দেখাতেই বলল, বিষ উঠেছে। নামাতে হবে। কম বয়সী এক বেদেনী চাচার কোমরে মুখ রেখে চুমুক দিয়ে পুঁজের মতো কী যেন বের করে। লোকে বলে এই পুঁজই হলো

বিষ। এর জন্যই যন্ত্রণা হয় শরীরে। চাচা প্রায় প্রতিবছরই বিষ নামান। বেদেরা চলে গেলে বলেন, ‘ দূর, বিষফিষ কিছু না। সব ভাঁওতাবাজি। কম বয়সের বেদ্‌নীগুলা যহন শরীরে মুখ রাইখা চুমুক দিয়া বিষ বাইর করে তহন ক্যামন জানি ঠ্যাকে। আরাম বড়। শরীর শিরশির করনি আরাম।’

শুধু চাচাই নন, বেদেরা আসলে দেখা যায় বেশির ভাগ কামলার শরীরেই যন্ত্রণা। বিবাহিত, অবিবাহিত, কম বয়সী, বেশি বয়সী সব পুরুষেরই লোভ বেদেনীদের দিকে।

ভাইজানের পাশে গিয়ে বসি। মা দুটো চিতই পিঠা আর শুকনো গুড় দেয় আমাকে। বসে বসে চিবোতে থাকি।

আজ তপন চলে যাবে। ঘণ্টা দুই পর লঞ্চ। ভাইজান যাবেন এক সপ্তাহ পর। তার শরীর খারাপ হয়েছে আরো। সুস্থ না হওয়ার আগ পর্যন্ত বাবা তাকে যেতে দেবেন না। বসে আছি চারজন চুপচাপ। ধান মাড়ানোর কাজ দেখছি। বাবাই কথা বললেন প্রথম।

‘তপন বাবা, দুপুরের খাবার নিয়া যাইও। খানা দেওয়ার ব্যবস্থা করা আছে।’

‘দরকার নাই তালওই। একা মানুষ। লঞ্চ থেকে নিয়ে নিব।’

‘দরকার আছে। তোমরা শহরের লোক অতি লায়েক। লঞ্চের খানা ভালো না। দামও ম্যালা। ঘরের খাবার থাকতে বাইরে ক্যান খাবা?’

তপন চুপ হয়ে যায়। ছেলে বুদ্ধিমান। অযথা তর্কে নেই।

বাবা তপনকে ঠিক সহ্য করতে পারছেন না। তার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে বিয়ে দেবেন। ছেলে থাকবে হাতের নাগালে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি।

কমলেশ আর আইয়ুব আসল একটু পর। আইয়ুব লঞ্চঘাটে পৌঁছে দেবে তপনকে। বেলা একটু বাড়তেই তপন গেল টিউবওয়েলে গোসল করতে। আজ গরম পড়েছে বেশ। এই সময় টিউবওয়েলের পানি ঠাণ্ডা থাকে। গোছগাছ আগেই করেছে তপন। গোসল করে খেয়েই রওনা দেবে।

আমরা বসে আছি এখনো। মা এক ফাঁকে কমলেশ আর আইয়ুবের জন্য বাটিভর্তি খই দিয়ে গেছেন। আইয়ুব খাচ্ছে কিন্তু কমলেশের আজ খাওয়ায় মন নেই।

‘থাকবা না তাইলে তুমি? ’ ভাইজানকে বলল বাবা ।
‘না । চলে যাব । সামনের সপ্তায় যাব । শরীরটা একটু ভালো হোক ।’
‘তা ভালো কথা । তোমার কোনো কাজে আমি নিষেধ করি নাই কহনও । একটা কথা বলব, ভাইবা দেকতে পারো । যদি চাও মেয়ে দেখতে পারি আমি । আবার নতুন কইরা জীবন শুরু করো । জায়গা-জমি যা আছে আমার তা দিয়া তোমাগের ভালোই চইলা যাবে ।’
‘তা আর হয় না বাবা । এই কথা ক্যামনে বলেন আপনি? আমার ঢাকা যাইতেই হবে । আপনার বউমা আছে সেখানে । তারে আমি কষ্ট দিতে পারি না ।’
‘আমার বয়স হইছে । আগের মতন একা থাকার সাহস পাই না । তুমি ভাইবা দেখলে খুশি হইতাম ।’
‘আপনার ছোট ছেলে তো আছে । সে দেখবে আপনাদের ।’ ভাইজান কথাটা বলার পর একটু ভালো লাগে । নিজেকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি আগে । কিন্তু বাবার কথা শুনে ভালো লাগার বোধটা কেটে যায় ।
‘ছোট ছেলের ওপর কহনই ভরসা করতে পারি না আমি । ভরসা তোমার ওপর ছিল । কিন্তু ভুল করছি আমি ।’
‘ভুল আপনি কিন্তু ঠিকই করছেন বাবা । আপনার জন্যই আমার জীবনটা এমন হইছে । আপনার সন্তানদের কথা চিন্তা করা উচিত ছিল ।’
‘এই নিয়া কথা হোক আমি চাই না । তুমি ক্যান গেলা? তোমার তো থাকা দরকার ছিল ।’
কথা কোনদিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না ঠিক । বাবা মনে হয় রেগে যাচ্ছেন । ঝামেলায় না গিয়ে আমি আর কমলেশ তাই চুপচাপ শুনতে লাগলাম ।
তপনের গোসল শেষ । মা তাকে খেতে দিয়েছেন ।
‘তোমার বউ আইলো না ক্যান? আসা উচিত ছিল তার । ’ একটু রাগ নিয়ে কথাটা বলেন বাবা ।
‘শরীরটা তারও ভালো না ।’
‘এইডা কোনো কথা হইলো না । মাইয়া মানুষের আবার শরীর খারাপ কী?’

বাবার এই কথার পর আর কথা চলে না। তিনি আর কিছুক্ষণ বসে থাকার পর উঠলেন। গেলেন বৈঠকখানার দিকে।

তপনের জন্য বড় দুটো রুই মাছ এনে রেখেছেন সকাল সকাল। সেগুলোতে বরফ দেওয়া আছে। যাওয়ার আগে আইয়ুবকে বললেন মাছগুলো তপনের সাথে লঞ্চে তুলে দিতে। গাছের কিছু ফলও দেওয়া হয়েছে।

বাবা এসব ব্যাপারে খুব ভালো। বোঝেন কাকে কিভাবে আপ্যায়ন করতে হয়, কিভাবে খুশি রাখতে হয়, কিভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হয় নিজের ক্ষমতার জোর।

আইয়ুব মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছে একটা। সে এই জিনিসও চালাতে পারে। তার জীবনে উন্নতি হবেই বলা যায়।

খেয়ে বের হলো তপন। ভাইজানের কাছ থেকে বিদায় নিল। ভাইজান জোর করে কিছু টাকা দিয়ে দিল তাকে। শরীর খারাপ লাগছে; তাই বেশি কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন এরপর।

তৃপ্তি নিয়ে খেয়েছে তপন। মাকে দেখলাম বারবার বলছে, ‘ দারুণ রেঁধেছেন মাওই। এই জিনিস আগে খাই নাই। দারুণ স্বাদ।’ মা চিংড়ি মাছের মগজ রেঁধেছেন আজ। বড় চিংড়ি মাছের মগজ আলাদা করে মরিচ, পেঁয়াজ মিশিয়ে রান্না করেন মা। মগজ ভাতের সাথে মাখলে ভাত একদম টকটকে লাল হয়ে যায়। প্রচন্ড ঝাল হলেও এর অসাধারণ স্বাদ নিতেই হয়।

আইয়ুব মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিতেই ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ে তপন আর কমলেশ। কী মনে করে জানি না, আমিও যাই সাথে। বাড়িতে ভালো লাগছে না। একটু বের হওয়া দরকার। মা দেখলাম চোখ মুছছে। তার অল্পতেই কোনো কিছুর জন্যে মায়া হয়। তপনের জন্য কাঁদছে এখন।

মোটরসাইকেলে চারজন ওঠা ঠিক হয়নি। উল্কার গতিতে ছুটছে আইয়ুব। রাস্তাও ভালো না। কমলেশের শরীরের সাথে কোনো রকমে চিপকে বসে আছি আমি। আইয়ুব ভালো চালক। ভাঙা রাস্তায়ও দারুণভাবে সামলাচ্ছে মোটরসাইকেলটা।

লঞ্চঘাটে পৌঁছাতে দেরি হলো না। তপনের জন্য কেবিন করা হয়েছে। এমন আত্মীয় ডেকে যাবে এটা কেমন কথা!
কেবিনে তুলে দিয়ে বের হলাম বাইরে। লঞ্চ ছাড়বে আরো কিছুক্ষণ পর। বের হলো তপনও। দোকান থেকে কিনল হালকা খাবার। আইয়ুব কই থেকে যেন কাশির ওষুধ নিয়ে এসেছে। এতে নেশা হয়। তপনের এই অভ্যাস আছে জানতাম না। আইয়ুবকে আগেই বলে রেখেছিল। লঞ্চে নেশা করাটা নাকি কঠিন আনন্দের!
হঠাৎ দেখা হলো জহর ভাইয়ের সাথে। অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। তার দোকানের জন্য ঢাকা থেকে কাপড় আসে লঞ্চে। সেগুলো নেওয়ার জন্য কর্মচারী নিয়ে চলে আসেন তিনি। কাজ নিজের হাতেই করা পছন্দ তার। কর্মচারীদের বিশ্বাস নেই। সুযোগ পেলেই চুরি করে লোকগুলো। খুব বেশিক্ষণ সময় দিতে পারলেন না জহর ভাই। ব্যস্ত খুব। অল্প কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর যাওয়ার আগে বললেন, 'টাকা তৈরি রাখছি তোমার। নিয়া যাইও। টেনশন নিয়ো না। আরে টাকার কী অভাব আছে নি আমার। হা হা।'
বিদেশে যাবার ব্যাপারটা তপনকেও বলেছি। ঢাকা গেলে পাসপোর্ট আর অন্যান্য কাজে সে সাহায্য করবে কথা দিয়েছে।
লঞ্চ ছাড়ার সময় হতেই আমাকে আলাদা করে ডেকে কিছু কথা বলল তপন। বলল, ভাইজানকে যেন দেখে রাখি। কথাগুলো শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। জানলাম ভাইজানের অ্যাপলাসটিক অ্যানাএমিয়া হয়েছে। রক্তের কঠিন রোগ। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাবে সে। জ্বর হবে নিয়মিত, চামড়ায় রক্তের লাল দাগ পড়বে। টিকবে না বেশিদিন।
তপন এসেছে তার বোনের তালাকের ঝামেলাটা মেটানোর জন্য। বোনের বিয়ে দিচ্ছে আবার তারা। ভাইজান রোগটার কথা কাউকে বলেননি। ঢাকায় একটা ছোট বাসা ভাড়া করেছেন। সেখানে গিয়ে একা একা মরতে চান তিনি। এক জীবনে মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন। আর কত?
তপনকে পছন্দ করেন ভাইজান। একমাত্র তাকেই জানানো হয় রোগের খবরাখবর। চিকিৎসায় অনেক বেশি খরচ। সুস্থ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

পুরো চিকিৎসার ব্যাপারটা তপন দেখছে। বোনের সাথে তালাক হয়ে যাচ্ছে তো কি, এই ভালো লোকটার জন্য সে কিছু না কিছু করবেই।
পোঁওওওও শব্দ করে লঞ্চ ছেড়ে দেয়। তপন ততক্ষণে গিয়েছে নিজের কেবিনে। একটু একটু করে দূরে সরে যায় লঞ্চটা। আমি ঠিকমতো দেখতে পাই না লঞ্চটাকে। কেমন যেন ঝাপসা সব। চোখের কী সমস্যা হলো তবে! আমি তো কাঁদি না। আমার তো কান্না আসে না। আজ এত জল কই থেকে আসে?
বাড়িতে ফিরতে রাত হলো। লঞ্চঘাট থেকে আর ফিরিনি কমলেশ আর আইয়ুবের সাথে। এলোমেলো ঘুরেছি সারা দিন।
মন ভালো ছিল না আর বাড়িতে যেতে ভয় হচ্ছিল খুব। এই কথা শোনার পর ভাইজানের সামনে কিভাবে যাব বুঝতে পারছিলাম না। এত সাহস যে আমার নেই।
বাড়িতে ফিরতেই হয়। রাত দশটার পর শেষ টেম্পোটা আসে। ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। সবাই ঘুমে শুধু জেগে আছি আমি। দূর আকাশে অপরিচিত একটা তারা বারবার জ্বলছে আর নিভছে। পাতলা একটা গেঞ্জি গায়ে চড়িয়ে বের হই নিজের ঘর থেকে। তারাদের পাগলামি দেখি কিছুক্ষণ। কিন্তু ভালো লাগে না। দরজা খোলা পেয়ে ভাইজানের ঘরে যাই। জানালা গলে চাঁদের আলো এসে চুইয়ে পড়ছে ভাইজানের ঘুমন্ত মুখে। কি সুন্দর পবিত্র আমার বড় ভাই। আমার ভাইজান। আর কিছুদিন পর ছাড়বেন এই পৃথিবী। এই যন্ত্রণা সহ্য করব কিভাবে?
এই মানুষটার সাথেই ছোটবেলায় শুয়েছি এক বিছানায়। কতবারই না ঘুমের ভেতর গায়ে পা তুলে দিয়েছি। মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থেকেছেন আমার অসুখে অনেকবার। কত না অন্যায় আবদার করেছি। নিজের কাপড় আমায় দিয়েছেন। নিজের পাতের খাবার তুলে দিয়েছেন আমার পাতে। নিজে মার খেয়ে বাবার মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন আমাকে। এই, এই মানুষটা চলে যাবে তা কিভাবে মেনে নেব আমি?

একটা চেয়ার টেনে ভাইজানের বিছানার পাশে বসি। আজ ভাইজানের পাশেই কাটুক রাতটা। পাহারা দেব। দেখি না কে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় ভাইকে? এত সহজে ভাইজানকে যেতে দেব না। দেব না।
আমার জেদও কি কম? শক্তিও কি কম?

**১৩.**

আলগী নদীর পাড় লাগোয়া রাস্তাটা পাকা হচ্ছে। চলছে ঢালাইয়ের কাজ । শহর থেকে আনা হয়েছে রোড রোলারসহ আরো নানা যন্ত্রপাতি। এসব দেখতে ভিড় করেছে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই। গ্রামে এখন কামলা পাওয়া কঠিন। চাষবাস ছেড়ে সব রাস্তার কাজে নেমেছে। সরকার বেতন হিসেবে দেয় কাঁচা টাকা। এই সুযোগ, লোভ ছেড়ে কোন বোকা চাষের কাজ করে? কাদামাটি গায়ে লাগায়?
নদীর পাড়ে উৎসব উৎসব ভাব। মাথার ওপর হলুদ রোদ্দুরকে আড়াল করার জন্য একটা রেইনট্রি গাছের নিচে দাঁড়ালাম। এখানে বেশ ছায়া। শান্তি শান্তি লাগে।
খুব বেশিক্ষণ শান্তি পেলাম না। আজহার ভাই এলেন। তিনি সম্পর্কে বড় ভাইয়ের মতো। তাঁর লাল চোখ দেখে বুঝলাম রাতভর মদ গিলেছেন। নেশা কাটেনি এখনো। তিনি লোক ভালো কিন্তু নেশা করেন নিয়মিত। এই একটাই দোষ তাঁর। প্রায় রাতেই বাড়ি ফিরে পাগলামি করেন । হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দেন, নাচেন নয়তো ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। নেশা কাটানোর জন্য ঘরের লোকজন প্রায়ই তাঁকে পুকুরে চোবান নয়তো জোর করে কাঁচা মাংস খাওয়ান। এসব করলে নাকি নেশা কাটে।
'ফিরোজ ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে। সে যা বলল তা সুবিধের না। এ রোগে বাঁচার আশা নাই বললেই চলে। ডাক্তার মানুষই যহন এমন কথা কয় তহন তো বুঝই।' জড়ানো গলায় কথাগুলো বললেন আজহার ভাই। কথা আটকে আটকে যাচ্ছে। তার চোখ ছোট। নেশার কারণে ঘুমঘুম ভাব হওয়ায় সেই চোখ ছোট লাগছে আরো।

‘চিকিৎসার ব্যবস্থা কি আজহার ভাই?’
‘মেলা টাকা লাগব ভাই। তা তোমার এসব জাইনা কি হইবো কও দেকি। কার হইছে এই সর্বনাশের রোগ?’
‘কারো না। ভাবলাম ডাক্তারি বিদ্যাটা জানি একটু।’
‘না কইতে চাইলে কইও না। বড় ভাইয়ের সাথে মশকারা ক্যান করো। মশকারা পছন্দের না।’
আজহার ভাই রাগ করেছেন। নেশা হলে তার অল্পতেই রাগ হয়।
‘ফিরোজ ভাই খালিশপুর আছে না? ’
‘হ। অইখানে ক্লিনিক দিছে। মেলা পয়সা তার। ডাক্তারের মতো একখান ডাক্তার হইছে আমার ভাই।’ ভাইয়ের কথা বলতে গিয়ে খুশি হয় আজহার ভাই।
তার একমাত্র ভাই বড় ডাক্তার। সবাই চেনে একনামে। গ্রামে আসলেই বিনে পয়সায় চিকিৎসা করান সবার। কোনো অহংকার নেই। একদম মাটির মানুষ। ফিরোজ ভাই সবাইকে সাহায্য করেন। রোগী সুস্থ হয়ে তার কাছ থেকে ফিরবেই। তার ক্লিনিকে নিয়ে ভাইজানকে নিয়ে ভর্তি করব কি না ভাবছি। আমার আসলে মাথার ঠিক নাই। ভাইজানের রোগের কথাটা জানার পর কষ্ট ছিল, দুঃখ ছিল। কিন্তু এখন কেন জানি ভেতরটা পুরো ফাঁকা হয়ে আছে। আজহার ভাইয়ের সাথে আমার কাজ শেষ। তার কাছ থেকে ফিরোজ ভাইয়ের ক্লিনিকের ঠিকানা আর ফোন নাম্বার নিয়ে নিলাম। নিশা আপার বাড়ি যাব ঠিক করেছি। এ বিপদ নিশা আপাই সামাল দেবেন।
আপা সব সময় ভাইজানকে চোখে চোখে রাখতেন। মেয়েরা এমনিতেই মায়াবতী।
ভাইজান ঠিক আছে কি না, পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে কি না–এসব নিয়ে মায়ের চেয়ে বেশিই ভাবত আপাটা। নিজের পড়াশোনা, জীবন নিয়ে ভাইয়ের থেকে আলাদা করে ভাবতে হবে এমন মনে হয়নি তার। মেনে নিয়েছিল সবাই বিষয়টা।

আস্ত গ্রামের মানুষ জানত এই ছেলেমেয়ে দুটো বড় হলেই বিয়ে করে ফেলবে। এমন ভদ্র ছেলেমেয়ে গায়ে কি আর কেউ আছে? ভালো মানিয়েছে দুজনকে। সারাক্ষণ একসাথে থাকে। একজন আরেকজনের চোখের আড়াল হলেই বিপদ। মা মেনে নিয়েছিল ব্যাপারটা। বোনের মেয়ে ঘরের বউ হয়েই না হয় থাকল! ক্ষতি তো নেই। তা ছাড়া ছেলেও পছন্দ করে নিশাকে। পুরো পরিবারটা তো অইটুকুন মেয়ে নিশাই আগলে রাখে।

বাবার ঝামেলা ছিল। নিশা আপাকে একদম পছন্দ করেন না তিনি। উটকো ঝামেলা কে-ই বা সহ্য করে।

ঠিকমতোই যাচ্ছিল সব। বড় সুখী ছিলাম আমরা। নিশা আপা আমাকে ভালোবাসেনি দেখে যন্ত্রণা ছিল মনে কিন্তু সবার সুখ দেখে সয়ে নিয়েছি। ভালোবাসায় সব সময় কিছু না কিছু পেতে হবে–এমন তো কোনো কথা নেই। পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষদের সবাই ভালোবাসে খুব। মানুষের ভালোবাসা পাবার জন্যই এদের জন্ম। সামান্য ব্যথায়ও এই মানুষগুলো কাতর হয়ে পড়ে। কারণে-অকারণে চোখ ঝাপসা করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে হলেও নিজেরটা ঠিক ঠিক আদায় করে নেওয়াই এমন মানুষদের কাজ। এই শ্রেণীর মানুষগুলোকে খুশি করার জন্যই অন্যরা নিজেদের জীবনটা না জেনেই নিলামে তোলে। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলো অকারণে কখনো ঝাপসা করে না চোখ। এদের চোখের জল দেখার সময়ও কারোর নেই। এমনকি এদের নিজেদেরও নেই। প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলোকে খুশি করতে গিয়ে এরা নিজেদের জন্য সময়ই বের করতে পারে না। আমি নিশ্চিত যে আমার অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সমস্যা নেই তাতে। ভালোবাসা ছাড়াই না হয় কাটিয়ে দেব আমার এক জীবন।

মাঝে মাঝে কষ্টের কথা ভেবে হার মানতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে মরে যেতে। পরে আবার ভাবি দুঃখ তো সবার আছে, হতাশ তো আমরা সবাই হই, তাই বলে ছাড়ব কেন পৃথিবী?

পরাজিত হতে তো আসিনি, লড়াই করতে এসেছি। এ জীবন তো একদম অসুন্দর নয়।

শেষ বিকেলে নীল আকাশের না জানিয়ে আচমকা লাল হয়ে যাওয়া, গাছের শেষ পাতাটির চুপটি করে বৃষ্টিতে ভেজা, জনতার হাটের চায়ের দোকানে কেতলির তলানিতে পড়ে থাকা লিকারভর্তি শেষ চা টুকুর তেতো স্বাদ, নৌকায় ছইয়ের ভেতর নিজেকে আড়াল করে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা কোনো এক মন ভার করা কিশোরী বধূর তির তির করে কাঁপা চোখের পলক জীবনকে সুন্দর করে।

জীবন এত সস্তা না। জীবনকে সুন্দর করতে হলে, সুখী হতে হলে জীবনকে সম্মান দিতে জানতে হয়। অভিমান ভাঙানোর জন্য কেউ না কেউ আছে। খুঁজলে ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে কেউ না কেউ হয়তো ভালোবাসে আমাকে। কিন্তু আমার খোঁজার ধৈর্য নেই। ইচ্ছেটাও নেই।

আমার ক্লান্ত লাগে। সকালগুলো, বিকেলগুলো, রাতগুলো আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে চাই। আমি চাই আগের মতো হয়ে যাক সব কিছু। ভাইজান আর নিশা আপা একসাথে থাকুক। বাবা-মা ভালো থাকুক। ভাইজান বেঁচে থাকুক আরো এক শত বছর।

জানি এসব চাওয়া পূরণ হবে না। সব চাওয়া পূরণ হয় না। নিশা আপারও হয়নি।

আমরা কেউ ভাবিনি এমনটা হবে। হঠাৎ একদিন দেখি মায়ের মুখ গোমড়া। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। শুধু কাঁদে আর বলে, 'আমার কপাল..আমার পোড়া কপাল।'

বাবাও দেখি বিচলিত খুব। একদুপুর মা আর বাবা দরজা আটকে নিজেদের ঘরে ঝগড়া করলেন খুব। অনেক চেষ্টা করেও বুঝিনি কিসের জন্য এ ঝগড়া। বুঝেছি শুধু ঝামেলাটা নিশা আপাকে নিয়ে। অনেক বড় ঝামেলা। এই প্রথম কোনো বিপদে নিশা আপাকে কাতর হতে দেখেছি। ভয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করিনি।

এই সময়ে বাবা তাড়াহুড়ো করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায়। বললেন, বাড়িতে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। আত্মীয়ের বাসায় নিরিবিলিতে পড়াশোনা করতে পারব।

মা নিশা আপাকে নিয়ে গেলেন তার বাবার বাড়ি। অনেক দিন পর যখন বাড়িতে আসলাম তখন শুনি পালিয়েছেন ভাইজান। যাবার আগে বাবার কাছে একটা চিঠি লিখে গেছেন। বাবা ছাড়া সে চিঠি পড়ার সুযোগ হয়নি আর কারো।

তত দিনে জেনে গেছে সবাই নিশা আপার গর্ভে সন্তান আসার কথা। সন্তান নষ্ট করে পাপ চাপা দেওয়ার জন্য মা নিশা আপাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন। লাভ হয়নি। সবাই বুঝে গিয়েছিল ভাইজানের পালানোর কারণ। কী দরকার ছিল এসবের?

বিয়ে করে চাইলেই তো সব হতো। সম্পর্কটা তো সহজই ছিল তাদের। কেন এ পাগলামি করল ভাইজান আর নিশা আপা। তার কারণ এখনো আমি খুঁজে বের করতে পারিনি। ভাইজান পালিয়ে যাবার বছর দুই পরই জহর ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয় আপার। ভাইজানের মতো সেও ছেড়ে চলে যান আমাদের। জয়তুন গাছের শেকড় দিয়ে মেসওয়াক করতে করতে উঠোনে পায়চারি করছেন জহর ভাই। নিশা আপার বাড়িতে আসাটা ঠিক হয়নি এমনটা মনে হয় এখন। ভাইজানকে নিয়ে তার এখন চিন্তা না করারই কথা। তা ছাড়া আপাকে বললে ব্যাপারটা অন্য সবাই জেনে যেতে পারে।

যা করার আমাকে একাই করতে হবে। বাঁচাতেই হবে ভাইজানকে।

তপনের সাথে ফোনে কথা হয়েছে। ঢাকায় গেলেই হাসপাতালে ভর্তি করার সব বন্দোবস্ত করে রাখার চেষ্টা করছি। ঠিক করেছি ভাইজান যাবার এক দিন পর মা-বাবাকে কোনো একটা অজুহাত দিয়ে ঢাকায় চলে যাব।

পাসপোর্ট আর বিদেশে চাকরির কাগজপত্র জোগাড় করার জন্য এমনিতেই ঢাকা যাওয়া দরকার।

'মিয়া, তোমারে সময় দিতে পারব না। কালিশুরি যাব এখন। চালান আসবে কাপড়ের।' মেসওয়াক শেষ করে ভেতর থেকে কাপড় বদলে এসে কথাগুলো বলেন জহর ভাই।

'সমস্যা নাই জহর ভাই। এমনি আসলাম।'

‘এমনি তো আর আসো নাই। বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়া জানতে আসছ জানি। তোমার অই ব্যাপারটা আমি দেখতাছি। বেহুদা দুশ্চিন্তা কইরো না। ভরসা রাখো। আমি জহর সব কাজে সফল।’
এখানে আসার কারণটা না জানানোই ভালো। আমি তাই অন্য কথা বলি।
‘কিসে যাইবেন? টেম্পো না ট্রলার।’
‘আরে মোটরসাইকেল কিনছি একখান। ড্রাইভারও রাখছি। এখনই আইবো। পয়সা তো কম হয় নাই। জীবনে কষ্টও করছি অনেক। এখন সুখের সময়। তাই একটু সুখ করতাছি আর কি।’
‘সবার কপাল তো আর আপনের মতো না।’
‘হুম। যাবা নাকি তুমি? নামাইয়া দিবোনে পথে।’
‘পরে যাব জহর ভাই। আসলাম যখন আপার সাথে কথা বইলা যাব।’
‘থাকো তাইলে। তোমার আপারে সকাল থেকে দেখি না। পাশের বাড়িটাড়ি গ্যাছে মনে হয়। আমি বকাবকি করি না। বাচ্চা হওয়ার সময়টায় যা করতে মন চায় করুন না হয়। শুন, তাড়া আছে। গেলাম আমি।’
কথা বলেই আর অপেক্ষা না করে চলে যায় জহর ভাই। বাড়ির সামনে রাস্তার অবস্থা ভালো না। মোটরসাইকেল আসবে বোর্ড অফিসের সামনে। সেখানে গিয়েই নতুন কেনা মোটরসাইকেলে চেপে কালিশুড়ি যাবেন তিনি।
জহর ভাই চলে যাবার পর চুপচাপ বসে থাকি আমি। বাড়ির ভেতর থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। সব চুপচাপ। বাড়িতে কেউ নেই মনে হয়। উঠোনে কয়েকটা ছেলে জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতে থাকে। তাদের হৈচৈ দেখে ভালোই লাগে। আমি উঠে খালপাড়ের দিকে যাই। বাড়ি চলে যাব কি না ভাবছি। আপা কখন আসে কে জানে। আমার এখন অনেক কাজ। অনেক কাজ পড়ে আছে।
এই খালপাড়ে লোকজন আসে না তেমন। আমি এসে লোক দেখে অবাক হই। তবে অবাক হবার পরিমাণটা আরো বাড়ে যখন দেখি নিশা আপা আর আইয়ুব কথা বলছে গোপনে খালপাড়ে এসে। কী কথা তাদের মাঝে? আইয়ুবের নৌকা চোখে পড়ে না কোথাও।

ভাইজান কি পাঠিয়েছে আইয়ুবকে? এমন তো হবার কথা না। ভাইজানের অসুখের কথা তবে কি জানে আপা? মনের ভেতর হাজারো প্রশ্ন এসে ভিড় করে। ক্লান্ত লাগে। অসহায় লাগে।
সব কিছু সবার পরে আমিই কেন জানি? আমাকে কি কেউ কখনো বড় ভাববে না?
বেলা গড়ায়। নিশা আপা কথা শেষ করে বাড়ির দিকে ফেরে। সটকে পড়তে হবে এখন। কিন্তু পারি না। আমার পা আটকে থাকে মাটিতে। কী করব ভেবে পাই না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই এ মুহূর্তে। প্রার্থনা করি তাই। সব কিছু ঠিক হয়ে যাক, যাক। প্রার্থনা করা ছাড়া আমার মতো হতভাগার আর কী-ইবা করার আছে।

**১৪.**

প্রথমে করা হয় বলাৎকার।
মেয়েটার পেটে বাচ্চা চলে আসার পর চেষ্টা করা হয় বাচ্চা নষ্টের। মেয়েটা চেয়েছিল বাচ্চাটা বাঁচুক। দোষ তো আর বাচ্চার না। বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে থেকেছে কয়েক মাস। কঠিন লড়াই করেছে।
দশ মাস দশ দিন পার হওয়ার আগেই পৃথিবীর মুখ দেখে বাচ্চাটা। এত তাড়াতাড়ি চলে আসার কারণেই হয়তো ওজন কম ছিল বাচ্চার। শরীরও খারাপ ছিল। পৃথিবীতে টিকে থাকার চেষ্টায় প্রতিটি দিন কষ্টে কেটেছে তার। মায়ের অবস্থাও ভালো ছিল না।
এত কম বয়সে বাচ্চা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না মেয়েটা। সে ভালোই ছিল। পড়াশোনা, প্রেম, স্বপ্ন–সব কিছু অনেক ভালো দিন যাচ্ছিল তার। জীবনে এমন ভয়ংকর ঝড়ের মুখোমুখি হতে হবে কখনো কল্পনাও করেনি সে।
চারপাশের মানুষদের সমালোচনা, কাছের মানুষদের তিরস্কার, প্রেমিকার এড়িয়ে যাওয়া– সব কিছু নিয়ে ভেঙে পড়েছিল মেয়েটা।
এক দিন রাতে বাচ্চার মুখে স্তন দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল ক্লান্তিতে। ঘুম থেকে উঠে দেখে পাশে আদরের ধন বাচ্চা নেই। বাচ্চাটিকে কয়েক দিন পর পাওয়া

যায় বাড়ির সামনের ডোবায়। শরীর পচার পর ছড়িয়ে পড়েছিল গন্ধটা। বাচ্চাটির দেহে মাথা ছিল না। মেরে ফেলার সময় শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। মাথা আর পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায়ই দিয়ে দেওয়া হয় কবর।

সন্তান হারানোর পর মেয়েটা একটুও কাঁদেনি। কেন কে জানে!

সন্তান হারানোর পর সে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে। বিয়ে করে শুরু করে সংসার জীবন। তার মুখে কখনোই হারানো সন্তানের কথা শোনা যায় না। তবে মাঝে মাঝে মাঝ রাতে ডাক ছেড়ে সে কাঁদে। ভাঙচুর করে ঘরের জিনিসপত্র।

এই গল্পটা নিশা আপার। গতকাল রাতে ভাইজান বলেছেন সব। আগে পরের ঘটনা মিলিয়ে সে যতটুকু জানেন, জানতে পেরেছেন তার সব বলেছেন আমাকে। বলতে বলতে বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। চোখ হতে গড়িয়ে পড়ছিল জল। আমাকে একটু পর পর বলছিলেন, 'ভাই পানি দে, গলা শুকায়। তেষ্টা পায়।'

কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, 'আমি খারাপ মানুষ রে ভাই। খারাপ মানুষ। আমার অই বয়সে সাহস ছিল না নিশার পাশে দাঁড়ানোর। এমন কিছু হইতে পারে বুঝি নাইকো কহনও। আমি চাইছিলাম যে নিশার সাথে এমন করছে তারে খুন করতে। পারি নাই। ক্যামনে করুম ক, তার সাথে যে আমার রক্তের সম্পর্ক। আমি জানতাম ঘটনা সামাল দেওয়ার জন্য নিশার সাথে আমার বিয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু খারাপ পুরুষ মানুষ যে আমি। যেই মেয়ের জন্য পাগল ছিলাম, এ ঘটনার পর তারে নষ্টা মনে হইল। নষ্টা মেয়েরে ঘরে তুলতে চাই নাই। নিশার যহন সবচেয়ে বেশি আমারে দরকার ছিল তহনই আমি পালাইলাম। ক্যামনে পারলাম? নিশার পাপে আমার জীবন ধ্বংস হইছে। আমি নিজের বউ ও সন্তান সব কিছু হারাইছি।'

এই সব কথা হবার সময় পাশে ছিল মা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা কেঁদেছে সে। নিজের পাপের কথা ভেবে হয়তো ক্লান্ত সে। মেয়ে হয়েও নিশা

আপাকে নিয়ে না ভেবে নিজের ঘরের মানুষদের নিয়ে ভেবেছে সে। চরম পাপ করেছে। করেছে ভয়ংকর পাপ।
বাবা গতকাল ছিল না। নয়া বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। বাবা গেছেন সেখানে। অনেক দিন পর মা-ছেলেরা একসাথে বসে কাটিয়েছি সময়।
ভাইজান চলে যাবেন। লঞ্চের টিকিট করতে এসেছি কেশবপুর। কলেজের কাগজপত্রেরও কিছু কাজ আছে। দেশের বাইরে চলে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে আর দেরি করতে চাই না। জীবন বিষিয়ে উঠেছে আমার। বেঁচে থাকার জন্য নতুন মানুষ চাই। চাই নতুন পরিবেশ, নতুন বাতাস।
একটা বাদুড় মরে পড়ে আছে। উঠোনে মরা বাদুড় দেখতে ভিড় করেছে ছেলেরা। পচে যাচ্ছে বাদুড়ের শরীর। লাল পিঁপড়া এসে ভিড় করেছে। পাশেই সেলুন। আমি বাদুড় আর মৃতদেহ দেখে উল্লাস করা ছেলেদের এড়িয়ে সেলুনে ঢুকলাম। দাড়ি বড় হয়েছে। নিজেকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় বনবাস থেকে ফিরলাম।
সন্ধে শেষ হয়ে আকাশের গায়ে আঁধার লাগতে শুরু করেছে। একটু পর রাত নামবে। দোকানগুলোতে জ্বলে ওঠে বাতি। ট্রলারগুলো ঘাটে এসে ভিড় করে। গ্রামে রাত হলেই বড় তাড়াতাড়ি নীরব হয়ে যায় সব।
দাড়ি কেটেই ঢাকায় প্রয়োজনীয় কয়েকটা জায়গায় ফোন দিয়ে দ্রুত বাড়ির পথ ধরলাম। কাজ আছে ভাইজানের সাথে।
ঘাটে নৌকা আছে। দেরি না করে উঠে পড়ি তাতে।
অনেক দিন পর একা একা আজ অনেক কাজ করলাম। এসব সময় কমলেশ থাকে সাথে। আজ নেই।
শ্বশুরবাড়ি আছে বন্ধুটা এখন। ভারতে যাওয়ার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে সব। যাওয়ার ব্যাপারে কমলেশ এখনো নিমরাজি। কিন্তু পরিবারের সবাই যেতে চাইলে তো আর না করা যায় না। আমি তাই কমলেশকে দোষ দিই না।
নদীর পাড় ধরে কাশের বন। চাঁদ উঠেছে। গোলগাল আস্ত একটা চাঁদ। চাঁদের বরফ শীতল আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ছে নদীর ওপর। হাত বাড়িয়ে সে আলো ধরি। ছুঁয়ে দিই।

বাতাসটা কেমন শীত শীত । জামার পাতলা কাপড় ভেদ করে ভেতরে ঢুকে কাঁপায় শরীর ।
ঘাটে পৌঁছাতেই দেখি ভাইজান চলে এসেছেন । তার শরীর অনেক খারাপ । গায়ে জ্বর । জামার ওপর দু-তিনটা চাঁদর চাপিয়ে এসেও ঠকঠক করে কাঁপছে সে ।
ভাইজানকে ধরে রেখেছে আইয়ুব । সেও যাবে আমাদের সাথে নিশা আপার বাড়িতে । নৌকা একটা ঘাটে বাঁধা আসে । নৌকা চালাবে আইয়ুব ।
উঠে পড়ি আমরা নৌকায় । জোয়ারের সময় এখন ।নৌকা চলতে থাকে দ্রুত । বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে আসে । কেমন মায়াবী মনে হয় সব কিছু ।
'সুন্দর না রে ।' বলেন ভাইজান । জ্বরে এখনো কাঁপছে । কপালে পট্টি দিয়েছি আমি । শীতের কারণে বলেছি তাকে নৌকার ছইয়ের ভেতরে থাকতে । কিন্তু কথা না শুনে বাইরে এসে চাঁদের আলো দেখছে সে ।
'সুন্দর তো । ভেতরে যান ভাইজান । জ্বর আপনার ।' বলি আমি ।
'আমি থাকি আর না থাকি ভালো থাকিস তোরা । আমার অনেক পাপ । পাপের শাস্তিও পাইছি । এখন মনে হয় সময় শেষ ।'
'কী বলেন এইগুলা । থাকবেন না মানে কী? ' বিরক্ত হয়ে বলি । এসব কথা ভালো লাগে না ।
'আমার বড় বাঁচতে ইচ্ছা করে রে । জীবনটা এমন হবে বুঝি নাই কহনও । তোর কি মনে হয়, নিশা কি মাফ করবে আমারে?'
'করবে । দুশ্চিন্তা কইরেন না না তো । আপার মতন মেয়ে হয় না । সে ভালো মেয়ে ।'
'জানি না । মাফ করলে তো ভালো ।' কথাটা বলে চুপ হয় ভাইজান । জ্বরের কারণে চোখ-মুখ কুঁচকে যায় যন্ত্রণায় ।
'ভাইজান আপনারে একটু জড়াইয়া ধইরা রাখতে পারি? ইচ্ছা করতেছে খুব ।' আমার কণ্ঠে কাতর আকুতি ঝরে পড়ে ।
ভাইজান কথা শুনে অবাক হয়, তারপর আস্তে করে আমাকে বলে, 'ধর জড়াইয়া । '

আমি শক্ত করে নিজের শরীরের সাথে চেপে ধরি ভাইজানের শরীরটা। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ভাইজান। তার শরীরের তাপ এসে লাগে আমার গায়। আমার কান্না পেয়ে যায়। আমি একটু একটু করে কেঁদে বলতে থাকি, 'ও ভাইজান, যাইতে দিমু না আপনারে। আমি ছোট মানুষ। একলা আর তো থাকতে পারি না। আমার বড় ক্লান্ত লাগে। ভাইজান আপনারে খুব দরকার। এইবার আপনি দায়িত্ব নেন। আমারে ছুটি দেন। ভাইজান... ।'

ভাইজান আমার কথায় পাত্তা দেয় না। একটু পরে জ্বরের কথা বলে আমাকে ছেড়ে ছইয়ের ভেতরে ঢোকে। আমি বাইরে থেকে শুনতে পাই ভাইজানের কান্নার আওয়াজ।

বুঝি না পরম করুণাময় কেন আমাদের পরিবারটার জন্য এত দুঃখ রেখেছে। কেন এমন ভাঙাচোরা, দুঃখ আমাদেরই ওপর। পরম করুণাময়ের করুণার কোনো কিছুই মনে হয় আমাদের জন্য নেই।

নৌকা পৌঁছায় নিশা আপার বাড়ির খালপাড়ে। এতক্ষণে চাঁদ চলে গিয়েছে মেঘের আড়ালে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে।

কারো সাহায্য না নিয়েই আপার বাড়ির দিকে যায় ভাইজান। আমাদের সাথে আসতে নিষেধ করে। ভাইজানের কথায় না করতে পারি না। এমন জ্বর নিয়ে অন্ধকারে যাবে, এটা ভেবে মন কেমন করে। কিন্তু তার জেদের কাছে হার মানতে হয়।

নৌকার ভেতর জ্বলতে থাকা হারিকেনটা নিভিয়ে আইয়ুব একটা বিড়ি ধরায়। অন্ধকারের ভেতর আলো বলতে ওই নৌকার আগুনটুকুই। আমি গাঁট হয়ে চুপচাপ বসে থাকি। করার মতো কিছু নেই। মনটা ভালো না। মনে হচ্ছে অলক্ষুণে কিছু ঘটবে। খালপাড়ে খুব মশা। মশা তাড়ানোতে মন দিয়ে সব কিছু ভোলার চেষ্টা করি।

ঠিক আধঘন্টা পর মেয়ের কণ্ঠে চিৎকার শুনতে পায় আইয়ুব। এরপর আমি শুনি। তারপর আওয়াজ বাড়তে থাকে। আশপাশের বাড়িগুলোর লোকজন বের হয়ে আসে। তাদের চিৎকারে ভারী হয় আকাশ।

আমি আর আইয়ুব দৌড়ে এসে নিশা আপার বাড়িতে ঢুকি। দেখি ভাইজানের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে মাটিতে। রক্ত মাটিতে মিশে মাটির রং হয়েছে ফ্যাকাসে লাল। শরীরে অনেকগুলো কোপের চিহ্ন।
পাশে দাঁড়িয়ে জহর ভাই। তার হাতে দা। ভাইজানের রক্তে মাখামাখি তার পোশাক। চোখে পশুর রাগ।
কয়েকজন জাপটে ধরে রেখেছে তাকে। কিন্তু লোকটাকে আটকে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে ।
নিশা আপা কাঁদছেন । তার শাড়িতে রক্ত। ভাইজানের মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছেন।
আইয়ুব ছুটে গেল ভাইজানের কাছে। লোকজনের ভিড় বাড়ছে। ভিড় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে সে।
আমি বের হলাম ঘরের বাইরে। অনেক কাজ পড়ে আছে। এসব নিয়ে ভাবলে এখন চলবে না। মেঘের আড়াল হতে বের হয়ে এসেছে চাঁদ। আমি চাঁদের আলো গায়ে মাখি। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।
না, ভাইজানের কাছে যাব না। তার রক্ত আমি গায়ে মাখতে রাজি না।
মরে গেলেও রাজি না।

**১৫.**

মাঝরাতে আচমকা বৃষ্টি শুরু হলো। ঝরঝর. ঝরঝর শব্দে পথঘাট যা পেল সামনে, সমানে সব ভিজিয়ে গেল ইচ্ছেমতো।
আমার ভেজা হলো না। বৃষ্টিটা আমাকে ভেজাতে পারল না। আমার মাথার ওপর মস্ত ছাদ। দশ ইঞ্চি পুরু দেয়াল চারপাশে। ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে আকাশ চোখে পড়ে না। শুধু খাঁখাঁ করা নিরেট এক কংক্রিটের দেয়াল গভীর, রাক্ষুষে আঁধার নিয়ে চেপে বসে আমার ওপর। গলা টিপে ধরে। নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। আমি ভয়াবহ যন্ত্রণায় গো-গো শব্দে কাতরাতে থাকি। দু-একটা নির্লজ্জ তেলাপোকা আমাকে অবাক আর অবহেলা করে আমার শরীরের

ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যায়। বড্ড ঘেন্না হয় তখন। তেলাপোকায় আমার বড্ড ঘেন্না।

মস্ত বড় দুই দালান দু পাশ থেকে দাঁড়িয়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে ফেলেছে এ ছোট্ট বাড়িটাকে। আকাশ আর দেখা হয় না বাড়ির বাসিন্দাদের। বৃষ্টির জলের পাগলামি, ভূমিতে আছড়ে পড়ার শব্দ শুনে বৃষ্টি হচ্ছে বুঝতে পারি আমরা। আজ বৃষ্টি হচ্ছে। এখন বৃষ্টি হচ্ছে। দারুণ খেপেছে বৃষ্টিটা। সব ভাসিয়ে নেবার মতলব এঁটেছে। লাভ নেই। যতই খেপুক, এ শক্তপোক্ত পাথরের দেয়ালের কিছুই হবে না। আর আমরা মানুষরাও তো পাথর। এই যে পাথরের মতো মন আমার এটাকে ভেজানো কি সহজ কাজ?

দু মাস হলো দেশ ছেড়েছি। ভাইজানের কথা মনে করে কাঁদার অভ্যেসটা ছাড়তে পারিনি এখনো। তিনি এমনিতেই মারা যেতেন। রোগটা কাবু করেছিল পুরোদমে। তবুও মেনে নেওয়া যায় না। আমার ভালো মানুষ ভাইটার চলে যাওয়া মেনে নিতে পারি না।

জহর ভাই জেলে আছেন। কেস চলছে। বাবা ভাইজানের হয়ে লড়াই করছেন। কেসে তাকে জিততে হবে। মান-ইজ্জতেরও একটা ব্যাপার আছে।

মা সাথে আছেন তার। এই বোকা মহিলা সারাটা জীবনই স্বামীর জন্য করে গেল। ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভাবলও না কখনো। স্বামী দ্বিতীয় ঈশ্বর, তা সে বাস্তবে পশু হলেও আপত্তি নেই। থাকুক তিনি তার ঈশ্বরের সাথে। আমি আর তার খোঁজ নেই না। নিতেও চাই না।

বিদেশে আসার আগে জহর ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে। আসার টাকাটা তিনিই দিয়েছেন। বলেছেন, 'শুন মিয়া, আমি কিন্তু মহাপুরুষ না। টাকা ফিরত দিওয়া লাগবু। তুমি ধনীফনি হইয়া গেলে দিয়ো। এক শ বছর সুময় দিলাম তুমারে। ইর মাজে দিলেই হবো। হা হা...।' জহর ভাই মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। আমি নিশ্চিত।

প্রতি মাসে নিশা আপাকে টাকা পাঠানো হয়। বাচ্চার মুখ দেখবে সে শিগগির। ভাইজানের খুনির কাছ থেকে টাকাটা নেবেন না বলেই জহর ভাই আমার মাধ্যমে টাকা পাঠায়। উপায় নেই বলে ছোট হলেও আমার কাছ থেকে নেন

তিনি টাকাটা। পাগলি নিশা আপাটা, লড়াকু নিশা আপাটা ভেঙে পড়েছে। বেঁচে আছে শুধু পেটের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাচ্চাটার জন্য।
আমি ভালো আছি। ভালোই আছি। একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছি। একলা মানুষ। কাউকে টাকা পাঠাতে হয় না বলে মাস শেষে অনেক টাকা জমে যায়। কোনো পিছুটান নেই। বেঁচে থাকার জন্য পিছুটান দরকার। প্রচণ্ড হতাশ এই আমিও বেঁচে থাকতে চাই। থাকতে হয়।
ভাবছি বিয়ে করব। জমানো টাকাগুলো মিলে মিলে অনেক হলে দেশে চলে যাব। চলে যাব অচেনা কোনো এক গ্রামে। বাড়ি করব। চাষবাস করব। একটা মেয়ে হবে। লিলিপুটের মতন ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে কাদামাটির পথে হাঁটব। কোল থেকে নেমে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সে বাবার সাথে হেঁটে যাবার জন্য বায়না ধরবে। তাকে বুলবুলি পাখি দেখাব। একসাথে মিলে চুরি করব টিয়া পাখির ডিম। প্রচণ্ড বর্ষায় বাপ-বেটি মিলে ধরব কই মাছ। কাঁচকলা আর টাকি মাছের ভর্তা খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলব। রাত হলে বুকের মধ্যে ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে দেব ঘুম। ঘুমানোর আগে গল্প হবে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প। আমি তাকে ভাইজানের কথা বলব। বলব নিশা আপাকে ভালোবাসার কথা, পৃথিবীর প্রথম দশটা ভালো মানুষের একজন জহর ভাইয়ের কথা, হারিয়ে যাওয়া প্রাণের বন্ধু কমলেশের কথা, আরো কত কি!
মাঝে মাঝে মেয়েকে রূপকথা শোনাব। শুনতে শুনতে দু চোখের পাতা ভারী হয়ে আসবে তার। বলব, 'খুকিরে, মারে তোর মতোই বেলি ফুলের, মালতী আর সন্ধ্যাবকুলের মতো একটা মেয়ে ছিল। পচা একটা সাপের দংশনের কারণে সে এখন কবরে থাকে। ঘুমায়। সোনার কাঠি তার শরীরে ছোঁয়ালেই ঘুম ভাঙবে। কিন্তু সেই সোনার কাঠি কই লুকানো জানা নেই। পুতুল নামের সন্ধ্যাবকুলের মতন মেয়েটাকে তোর বাবার খুব মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে। সে তোর বাবার বোন। তোর ফুপি ...।'
এভাবে বলতে বলতে আমার গলা ধরে আসবে। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়বে চোখ হতে। মিথ্যা বলেছি। আমি আসলে ভালো নেই। কষ্টে আছি। কষ্টে আছি অনেক।

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। শব্দ শুনে বোঝা যায়। সকাল সকাল কাজ। একটু ঘুমানো দরকার। ঘুম আসে না। মাথার ভেতর অন্য পৃথিবী। সে পৃথিবীতে আমি অচেনা গাঁয়ে সংসার করি। মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। জানি এসব কিছুই সত্য হবে না। সবার স্বপ্ন সত্যি হয় না। কারো কারো হয়। আমি সেই কারোর দলে নই। কারোর দলে নেই। আফসোস।